কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গান

Hindu Devotional Songs of Kazi Nazrul Islam: A Study

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
এম.ফিল.ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
আশা সরকার
এম.ফিল. গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৮২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল, ২০২২

Dhaka University Institutional Repository

জন্ম ঃ ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬
২৪ মে, ১৮৯৯

মৃত্যু ঃ ১২ ভাদ্র, ১৩৮৩
২৯ আগস্ট, ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গান'(Hindu Devotional Songs of Kazi Nazrul Islam : A Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার এম.ফিল. ডিগ্রি অর্জনের জন্য সম্পাদিত মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটি সম্পূর্ণভাবে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভ অথবা এর অংশবিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য পেশ করা হয়নি এবং কোনো জার্নাল, সাময়িকী, পুস্তক কিংবা কোনো প্রকাশনা আকারেও এই গবেষণাকর্ম বা এর কিয়দংশ প্রকাশিত হয়নি।

আশা সরকার
এম.ফিল. গবেষক
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৬-২০১৭
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৮২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আশা সরকার, রেজিঃ নং- ১৮২, শিক্ষাবর্ষ- ২০১৬-২০১৭ কর্তৃক উপস্থাপিত 'কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গান' (Hindu Devotional Songs of Kazi Nazrul Islam : A Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছেন। এটি গবেষকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি। আমার নিকট সম্পূর্ণ মৌলিক মনে হওয়ায় অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল. ডিগ্রির উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করছি।

তত্ত্বাবধায়ক
ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গান' (Hindu Devotional Songs of Kazi Nazrul Islam : A Study) শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজ সম্পন্ন করতে পেরে সৃষ্টিকর্তার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আকলিমা ইসলাম কুহেলী এবং আমার যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী) কে। তাঁদের মতো অভিজ্ঞ এবং সহযোগিতাপূর্ণ শিক্ষকের সাহচর্য, দিক-নির্দেশনায় গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে পেরে আমি গর্ব বোধ করছি। গবেষণার সূচনা থেকে অন্ত অবধি তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা, নির্দেশনা এবং অনুপ্রেরণার প্রসূত ফসল হলো এই অভিসন্দর্ভটি। তাঁদের প্রতি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা এবং অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রশিদুন্ নবী কে।

শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রিয়াঙ্কা গোপ কে যিনি কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গান-এ বিষয়টি নিয়ে আমার মধ্যে অসীম আগ্রহ ও কৌতূহলের সৃষ্টি করেন। কাজী নজরুল ইসলামের সুবিশাল সৃষ্টি কর্মের মাঝে সনাতন ধর্মীয় গানগুলো একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে যার সঠিক ব্যবহার, চর্চা, প্রচলন, বিস্তার প্রমুখ বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য আন্তরিকভাবে আমাকে সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক খায়রুল আনাম শাকিল এবং কল্পনা আনাম কে যাঁদের কাছে গবেষণাকর্ম সম্পাদনকালে অনেক সহযোগিতা পেয়েছি। আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক টুম্পা সমদ্দার কে।

এছাড়া এই গবেষণাকর্ম সম্পাদানে সময়ে অসময়ে বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আমার বিভাগের অগ্রজ মেহফুজ আল ফাহাদ (প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), যাঁর প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বন্ধু দেবশ্রী দোলনকে (প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়) এবং এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে।

শ্রদ্ধাবনত হয়ে স্মরণ করছি আমার মা, বাবা, দাদা, বৌদি-কে যাঁদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও সহযোগিতা আমার চলার পথকে সবসময় সুগম করেছে। সেই সাথে আমার বিবাহসূত্রে প্রাপ্ত আরেক মা-বাবা কে জানাই আমার শ্রদ্ধা যাঁরা সবসময় আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন।

পরিশেষে যাঁকে ধন্যবাদ জানালেও কম হবে, যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় সমস্ত প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি তিনি হলেন আমার জীবনসঙ্গী পার্থ সারথী মোহন্ত (সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা) । তাঁর আস্থা, ঐকান্তিকতা সবসময় অন্যতম পাথেয় হিসেবে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

আশা সরকার

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

বাঙালির যুগ যুগান্তরের ইতিহাসের সাথে মিশে আছে শিল্প ও সৌন্দর্যের অর্ণবে অবগাহন। বাঙালির প্রাণের জন্য যেমন চাই জল, আলো, বাতাস, খাদ্য তেমন চাই শিল্প, সংগীত, সাহিত্য চর্চা যাকে বলে প্রাণের খোরাক। এই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধারার উদ্ভাবন হয়েছে। চর্যাপদ থেকে শুরু করে গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতির পদাবলি, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলগান, পাঁচালি, কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতি অনুষঙ্গের দ্বারা সংগীত ও সাহিত্য এ দু'য়ের সুধারস আস্বাদন করতে লাগল সাধারণ মানুষ। পরবর্তীকালে সংগীতের নানা শাখা, প্রশাখা, উপশাখা প্রবাহিত হয়ে বহু ঘরানার মিলনক্ষেত্রে উপনীত হয় এবং বাংলা গান বিশিষ্টতা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯৩১), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০), অতুল প্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এই পঞ্চকবি ও সংগীতজ্ঞদের হাত ধরে। তাঁদের মধ্যে কাজী নজরুল ইসলাম যেন অবারিত মরুর বুকে এক ফোঁটা জলের হাহাকার নিয়ে এসেছিলেন। প্রেম, দ্রোহ, মানবিক চেতনার জারক রসে সঞ্জীবিত করেছেন বাঙালি মানসকে। আবাল্য সংগ্রাম, সংঘাত, জাতিভেদ, কুসংস্কার, বর্ণবিভেদের মধ্য দিয়ে জীবনের প্রতিটি স্তরকে, প্রতিটি পর্যায়কে তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আর এ বোধগুলিই পরবর্তীকালে তাঁকে বিকশিত করেছিল মানবিক সত্তা হিসেবে।

ঐতিহ্য, আত্মীকরণ এবং সর্ববিধ বন্ধন অতিক্রমণ প্রয়াস নজরুল চরিত্রের একটি স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্য। শুরু থেকে শেষ অবধি নজরুলের সৃষ্টিকর্মের মাঝে একটি যত্নশীল অনুশীলন প্রত্যক্ষ করা যায়, তা হল নীচতা আর হীনতার চেয়ে পাপ আর নেই। সমস্ত নীচতা, হীনতা, সংকীর্ণতা বর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন মানুষের কবি, মানবতার কবি। এককভাবে দেখলে নজরুলকে কখনও মনে হতে পারে নিষ্ঠাবান মুসলমান, কখনও বা ব্রতচারী হিন্দু কিন্তু সমন্বিত ও সামগ্রিক বিচারে তিনি সর্বোপরি মানুষ। আল্লাহ-ভগবানের মাঝে যেখানে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা নেই, সেখানে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অহংবোধ, দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। সনাতন ধর্মীয় গান রচনা বা চর্চাকালে বহু মানুষ তাঁকে নাস্তিক, কু-সন্তান বলেছেন কিন্তু শৈশবের অসাম্প্রদায়িক জীবনচিত্র এবং বিভিন্ন ধর্মীয় পাঠ্য পুস্তকের জ্ঞান তাঁকে করেছে পরমতসহিষ্ণু। সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি ঐক্য ও সাম্যের সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যেই কালী সেই কৃষ্ণ, যেই আল্লাহ, সে-ই ভগবান। এ উপলব্ধিকে সঙ্গী করে, অন্তরে ধারণ করে সনাতন ধর্মের অসংখ্য অনুষঙ্গ, ধর্মীয় ঐতিহ্য, পৌরাণিক কাহিনী প্রভৃতিকে আশ্রয় করে অসংখ্য চমকপ্রদ আধ্যাত্মিকতার গানে নিজ সৃষ্টিকে সমুন্নত করেছেন । কখনো সেখানে শ্যামা ধরা দেন মাতৃরূপে, কখনো বা অভিমানিনী কন্যা রূপে, আবার কখনো দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালনকর্তী রূপে অবতীর্ণ হন। আবার কখনো শ্যামা বলে ডাকলে ধরা দেন শ্যাম হয়ে, কখনো আগমনী রূপের আলোকছটায় আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে শঙ্খধ্বনি আবার বিসর্জনের করুণ সুরে বেজে ওঠে মারওয়া বা মালকোষের ধ্বনি। নজরুলের সৃষ্টির মাঝে নীলকণ্ঠ শিব কখনো সৃজন করছেন ছন্দে, আনন্দে আবার কখনো সংহার করছেন রুদ্রভৈরব রূপে। শুধু তাই-ই নয় রাম-সীতা, সাবিত্রী-সত্যবান, যুধিষ্ঠির, কর্ণ প্রমুখ

চরিত্রাবলীর দৃঢ়তা, স্বচ্ছতার পাশাপাশি পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য গান। জীবন সায়াহ্নে একমাত্র সৃষ্টিকর্তার চরণে সমর্পিত হয়ে দুস্তর, দুর্গম-দুঃখ জলধিতে জীবন ভেলায় পারাবারের কথাও নজরুল চমৎকার উপমায় ফুটিয়ে তুলেছেন। মন্দির, মসজিদে বৃথাই সৃষ্টিকর্তাকে না খুঁজে মানুষের অন্তরে তাঁর বিরাজ সদা-সর্বদা এই অমোঘ সত্যকে প্রস্ফুটিত করেছেন গানের বাণীতে। মূলত কাজী নজরুল ইসলাম সনাতন ধর্মীয় গানগুলো সৃজনের মাধ্যমে এক নবতর সংযোজন করে গেছেন বাংলা সংগীত জগতে।

এ গবেষণায় কাজী নজরুল ইসলাম রচিত সনাতন ধর্মীয় মোট ৮৫২ সংখ্যক গান পাওয়া গেছে। সকল তথ্য, উপাত্তের ভিত্তিতেই কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের রূপ, বৈভব, বৈচিত্রতা তুলে ধরার প্রয়াস থাকবে এ গবেষণাকর্মে।

সূচিপত্র

ঘোষণাপত্র iii
প্রত্যয়নপত্র iv
কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
সারসংক্ষেপ vi
সূচিপত্র viii

ভূমিকা ১

অধ্যায় বিভাজন ৪

১. প্রথম অধ্যায় : বাংলাগান এবং কাজী নজরুল ইসলাম ৬

১.১ বাংলাগানের সূচনা ৬

১.২ কাজী নজরুল ইসলামের জীবনপ্রবাহ ৯

২. দ্বিতীয় অধ্যায় : নজরুলের সনাতন ধর্মীয় চিন্তা ১৭

৩. তৃতীয় অধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের শ্রেণিবিভাগ ২২

৩.১ শ্রেণিবিভাগ ২২

৩.১.১ শ্যামাসংগীত ২৪

৩.১.২ দুর্গাসংগীত ও আগমনী-বিজয়া গান ২৮

৩.১.৩ শিবসংগীত ৩০

৩.১.৪ কৃষ্ণসংগীত ৩৩

৩.১.৪.১ কীর্তন ৩৩

৩.১.৪.২ ভজন ৩৫

৩.১.৫ অন্যান্য ভক্তিমূলক গান ৩৭

৪. চতুর্থ অধ্যায় : কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের তালিকা ৪০

উপসংহার ৬৬

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৬৮

ভূমিকা

আবহমান কাল ধরে সুবৃহৎ প্রেক্ষাপট এবং বৈচিত্রপূর্ণ আঙ্গিকে বাংলা গানের বিকাশ ঘটেছে। গানের মধ্য দিয়ে বাঙালির শৈল্পিকসত্তা এবং সৃজনশীলতার যে বিপুল বিকাশ ঘটেছে, তার স্বরূপ বা সামগ্রিক রূপটি পরিগ্রহ করে ওঠা বেশ দুরূহ। এই সূত্র সন্ধানের ক্ষেত্রে অগ্রসর হলে দেখা যায় বাংলাগানের বিকাশে উত্তর ভারতীয় সংগীত ও মার্গসংগীতের বিস্তর প্রভাব রয়েছে। তারও পূর্বে প্রবন্ধ সংগীতের প্রভাবও বাংলা গানে বিদ্যমান ছিল তবে তেমন আভিজাত্য লাভ করতে পারেনি। তাই একদিকে যেমন কাব্যভিত্তিক লঘুসংগীতের ধারা, অপরদিকে দেশি-বিদেশি সুরের উদাত্ত অভ্যর্থনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাগানের ক্ষেত্রে এক মোহিনী মায়া সম্বলিত ঐশ্বর্য ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দিগন্তকে উপস্থাপন করেন। এর পূর্বে এবং পরবর্তীকালেও বাঙালি রচয়িতাগণ মার্গ সংগীতের অন্ধ অনুকরণ না করে বরং কিছুটা আলাদা পথে হেঁটেছেন যার প্রকাশ পাওয়া যায় বাংলা গানে। এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সেন, নিধুবাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুল প্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন এবং কাজী নজরুল ইসলামের মতো গীতিকবিদের নাম উল্লেখ্য যাঁরা একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সুরস্রষ্টা এবং সংগীতজ্ঞ। পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাগানের এই বহমান ধারাকে বৈচিত্রময়তা, নতুনত্ব এবং স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে সমুন্নত করতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগমন বিদ্রোহীর বেশে কিন্তু বাংলাগানের ক্ষেত্রে তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যের সুর-সুধা, সাকী, খেজুরগাছ, প্রখর রৌদ্রতাপ আর ঊষর প্রান্তরের শ্যামলিমা নিয়ে হাজির হন যা বাঙালির কাছে নতুনত্বের বার্তা বয়ে এনেছিল। সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন এক যুগান্তকারী প্রতিভার অধিকারী। সংগীতের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে তাঁর পদচারণা ছিল না; প্রতিটি ধারায় তাঁর অবাধ বিচরণ শিল্প, সংস্কৃতি অঙ্গনে এক মাইলফলক হয়ে আছে। নজরুল চিত্তের ভাবোচ্ছ্বাস যেন সংগীতকুসুম হয়ে বিকশিত হয়েছে।

নজরুল যখন সাহিত্যের দুয়ারে পা রাখেন, তখন মধ্য গগনে প্রখর সূর্যালোকের মতই আপন প্রতিভার কিরণে চারপাশ আলোকিত করে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সাধারণ কবি লেখক তো বটেই, অনেক প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকদের পক্ষেও তখন সম্ভব হয়নি কবি গুরুর সে প্রতিভাকে এড়িয়ে সাহিত্য, সংগীত জগতে স্বতন্ত্র মর্যাদার আসন প্রতিষ্ঠা করা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানের ভক্ত হয়েও এমনকি প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের গানের চর্চা করেও নজরুল কিন্তু সে অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

নজরুলের জন্ম বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ মে, বর্ধমান জেলার চুরুলিয়ায়। নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন। মাত্র ৮ বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে জীবিকা নির্বাহের অন্বেষণ করতে হয় তাঁকে। দরিদ্রতার কষাঘাত এবং অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতার দরুণ কিশোর বয়সেই নজরুল জীবনের কঠোর, কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন হন। সেই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো, প্রতিষ্ঠা পাওয়া প্রকৃত অর্থে দুষ্কর ছিল। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের অদম্য মেধা, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় তাঁকে আজ বিশ্ব দরবারে এনে হাজির করেছেন। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত একের পর এক কালজয়ী সৃষ্টি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে সাহিত্য ও সংগীতের ভান্ডার।

নজরুলের সংগীত রচনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রথমে তাঁর মনে সুরের আনাগোনা চলত এরপর বাণীর আবির্ভাব হত। নজরুল বরাবরই বাণীর চেয়ে সুরকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি তাঁর সংগীত ভান্ডারকে নানারকম বিশ্লেষণধর্মী সুর বৈচিত্রে ভরপুর করে রেখেছেন। অবারিত ঔদার্যে সুরের ইন্দ্রজাল বুনেছেন এবং এতে কীর্তনীয় ঢঙ, লোকগীতির ঢঙ, রাগ রাগিনীর মিশ্রণ, তালের মিশ্রণ, বিদেশি সুরের খেলা এরকম অনেক রসদের সন্ধান পাওয়া যায়। নজরুলের গানে গজলের আবহ থেকে শুরু করে আধুনিক, ইসলামিক, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, ভজন, রাগপ্রধান, প্রেমের গান, হাসির গান, উদ্দীপক গান, মানবতার গান, স্বদেশের গান, নারী শক্তির গান সব মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। সকল শ্রেণির মানুষকে নিয়ে তিনি লিখেছেন, সকল ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে যেয়ে মানুষকে নিয়ে আজীবন রচনা করে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে জাগরণের ধ্বনি ধ্বনিত হয়েছে।

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ও সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হলেও তাঁর সনাতন ধর্মীয় গান, সনাতন ধর্মীয় গানের বিচিত্রতা, ঐশ্বর্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর তেমন গবেষণা বা আলোচনা হয়নি। সনাতন ধর্মে নজরুলের যে অবারিত জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সম্মান, শ্রদ্ধাবোধ এবং এ বিষয়ের উপর যথেষ্ট রচনা, রসদ সত্ত্বেও হয়তো তেমনভাবে সকলের সামনে প্রতিভাত হয়নি। খণ্ড খণ্ড বিষয় নিয়ে আলোচনা বা গবেষণা হলেও এর ব্যাপকতা এবং দর্শন নিয়ে বিস্তর গবেষণা করা সম্ভব। এ কারণেই নজরুলের সনাতন ধর্মের ভাবনা, সনাতন ধর্মচিন্তা, সনাতন ধর্মীয় বিভিন্ন আঙ্গিকের গান রচনাসহ সেগুলোর তালিকাকরণ প্রসূত গবেষণা কার্য পরিচালনা ও প্রকাশ করলে তা নজরুল গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নবতর এবং মূল্যবান সংযোজন হিসেবে গণ্য হবে বিধায় বিষয়টিকে আমি গুরুত্বসহকারে সানন্দে গ্রহণ করেছি। কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানগুলো আমাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। মুসলিম হয়ে সনাতন ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে যে ভাবাবেগ সৃজন করেছেন, বাণী ও সুরে যে প্রগাঢ়তা দেখিয়েছেন; প্রকৃত অর্থে একজন আধ্যাত্মলোকের

ব্যক্তির পক্ষেই তা সম্ভব আর এ বিশালতা বারংবার আমাকে মুগ্ধ করে। আমি আমার এই গবেষণার মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ে বা অঙ্গনে কিছুটা প্রবেশ করতে চেয়েছি মাত্র।

এ গবেষণা পত্রে চারটি অধ্যায়ে বাংলা গান এবং নজরুল ইসলামের সাহিত্যে আগমন, নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী, নজরুলের সনাতন ধর্মীয় চিন্তা বা প্রেক্ষাপট, নজরুলের সনাতন ধর্মীয় গানগুলোর শ্রেণি বিভাগ, বিচিত্রতা এবং ৮৫২ সংখ্যক গানের তালিকা শ্রেণিবিভাজন পূর্বক উল্লেখ করা হয়েছে। কবির নিমগ্নতা, আধ্যাত্মবাদ, সাধনা, প্রজ্ঞা দৃষ্টির বিভিন্ন দিকের আলোচনা হয়েছে। সাম্যবাদ এবং অসাম্প্রদায়িক সোচ্চার কণ্ঠ প্রভৃতি বিষয়ের উপর এ গবেষণা পত্রে আলোচনা করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মটি ভবিষ্যতে কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গান সম্পর্কিত অন্যান্য গবেষণার সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা রাখি।

অধ্যায় বিভাজন

কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের ব্যাপকতা, সনাতন ধর্মীয় গান রচনার পেছনে নজরুলের চিন্তা-চেতনা, উৎস প্রমুখ প্রেক্ষাপটে বর্তমান গবেষণা। গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে এই গবেষণা প্রতিবেদন বা অভিসন্দর্ভকে নিম্নোক্ত চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে–

প্রথম অধ্যায় ঃ বাংলাগান এবং কাজী নজরুল ইসলাম

অধ্যায় বিন্যাসের শুরুতেই রয়েছে বাংলাগান এবং কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা। অধ্যায়টিতে বাংলাগানের সূচনা, বিকাশ ও ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে কাজী নজরুল ইসলামের জীবন প্রবাহ সন্নিবেশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নজরুলের সনাতন ধর্মীয় চিন্তা

মানবতা, শান্তি, সাম্য, বিদ্রোহের বার্তাবাহক হয়ে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগমন। সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে বিভিন্ন ধর্মাচারণ, ধর্মীয় গ্রন্থ পঠন-পাঠন, ধর্মীয় জ্ঞানচর্চা ইত্যাদিতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে তাঁর রচনা অব্যাহত রেখেছেন। সনাতন ধর্মীয় ভাবনা এবং সনাতন ধর্মীয় গান রচনার পেছনে তাঁর চিন্তা এবং প্রজ্ঞাবোধের সন্নিবেশন সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা সাহিত্য হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এই যুগল মিলনে নজরুল ইসলাম বিশ্বাসী হয়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন আচার-আচরণ, মিথ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে তাঁর রচনায় আপন করে নিলেন যা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সনাতন ধর্মীয় গানের শ্রেণিবিন্যাস আলোচনা করা হয়েছে উক্ত অধ্যায়ে যেখানে শ্যামাসংগীত, শিব-দুর্গা, কৃষ্ণ বিষয়ক সংগীত, কীর্তন, ভজন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের তালিকা

সনাতন ধর্মের ব্যাপকতা এবং গভীরতা আস্বাদন করে কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় ৮৫২ সংখ্যক সনাতন ধর্মীয় গান রচনা করেছেন যার শ্রেণিবিভাজনসহ একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

পরিশেষে উপসংহারে উপরোক্ত সকল অধ্যায়ের একটি সার্বিক বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা এবং সমন্বয়বাদী চেতনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অসাম্প্রদায়িক আত্মবোধ এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে গভীর ধর্মদর্শন ও জীবনবোধের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। যার ফলে সনাতন ধর্মীয় গানের নব প্রস্ফুটন আশা করা যায়।

উক্ত গবেষণায় বানানের ক্ষেত্রে আভিধানিক বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে সহায়ক গ্রন্থাবলী, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল এবং বিভিন্ন তথ্য উৎসের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

বাংলাগান এবং কাজী নজরুল ইসলাম

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক আলোড়নকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বাংলার সাহিত্য, গান, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে নজরুলের উপস্থিতি প্রবল এবং সুতীব্রভাবে অনুভূত। বাংলাগানে কাজী নজরুল ইসলামের আগমন বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে নজরুলের জীবনীসহ তাঁর আবির্ভাবের সময় বাংলাগানের প্রকৃতি, তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্বোপরি ঐ উপমহাদেশের চিত্রপট সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

১.১ বাংলাগানের সূচনা

বাংলাগানের ইতিহাস বাংলা ভাষার ইতিহাসের মতই পুরোনো। বাংলাগানের সূচনা হয়েছিল আজ থেকে হাজার বছর আগে। বাংলাগানের সূচনা মূলত ঘটেছিল প্রবন্ধ সংগীতের আদর্শে। চর্যাগীতিই বাংলা ভাষা ও সংগীতের প্রাচীন নিদর্শন যা একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধসংগীত । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী'বৌদ্ধ ধর্মের ইতিবৃত্ত' সন্ধানে নেপালরাজ গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন। তবে চর্যার পূর্বেও বাংলায় সংগীতের চর্চা ছিল এবং উৎকর্ষও লাভ করেছিল এমনটা অনুমিত হয় সেই সময়কালের খোদাই চিত্রে অঙ্কিত নৃত্যভঙ্গি এবং বাদ্যযন্ত্রের নিদর্শন দেখে। গুপ্ত যুগ ও পাল রাজত্বের প্রথমদিকে বাংলায় সেই সংগীতের উৎকর্ষ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু উক্ত সংগীতশৈলী কিভাবে গীত হত বা তার সাংগীতিক রূপ কেমন ছিল তা জানা যায় নি। তবে চর্যাগীতিকেই বাংলা ভাষায় রচিত আদি বা প্রাচীনতম বাংলাগান বলা যায় যা ক্রমবিকাশের পথ ধরে বর্তমানে পৌঁছেছে সমৃদ্ধতর রূপে। জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিদ্যাপতির পদাবলি এবং পরবর্তীকালে বাংলা বৈষ্ণবপদাবলি রচিত হবার পর বাংলাগান আরো বিশেষভাবে পরিপুষ্ট ও অধিকতর সৌন্দর্যমন্ডিত হয়।

বৈষ্ণব পদাবলিতে বাংলার আঞ্চলিক লোকসংগীত এবং হিন্দুস্থানী সংগীতের মিশ্রণের ফলে সেখানে এক নতুন ধরণের সাংগীতিক সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি গীতগোবিন্দ এবং মঙ্গলকাব্য সংশ্লিষ্ট গানগুলোতেও রাগসংগীতের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মূল বিষয় ছিল হিন্দুস্তানী রাগসংগীতের সঙ্গে বাংলার আঞ্চলিক সংগীত রীতির এক অপূর্ব মিশ্রণ। পরবর্তীকালে জনসাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস কণ্ঠে সম্মিলিত চিত্তের আবেগ প্রকাশ পায় কীর্তনের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে। পদাবলি কীর্তনের গায়নকলায় যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে হিন্দুস্তানের উদ্ভাবিত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরির সম্পর্ক রয়েছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন কর্তৃক শাক্ত পদাবলি যখন প্রবর্তিত হয় তখনই হিন্দুস্তানী সংগীতের ধারায় ধ্রুপদের পর খেয়ালের উদ্ভব ঘটে। রামপ্রসাদের সমসাময়িক কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর যিনি ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের রাজসভার সভাকবি। বাংলাগানের ধারায় রাগসংগীতের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর দুই দশকের মধ্যে এবং শাক্ত সংগীতের ভরা দিনে বাংলা গানের ইতিহাসে এক নতুন যুগ প্রবর্তিত হয় যাকে টপ্পার যুগ রূপে অভিহিতি করা হয়। রামনিধি গুপ্ত সংক্ষেপে নিধুবাবু বাংলায় এই টপ্পা ঐতিহ্যের প্রবর্তনকারীরূপে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিধুবাবুই সে যুগে বাংলার

প্রেমবেদনাকে ক্ষুদ্র গীতের ছিদ্র দিয়ে অসীম রাগিণীতে ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। এর সাথে কালী মির্জার নামটিও চলে আসে। তিনি বারাণসী, লক্ষ্মৌ ও দিল্লীতে টপ্পায় প্রগাঢ় শিক্ষা অর্জন করে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। টপ্পা প্রচলনের সমসাময়িক কালেই বাংলায় ধ্রুপদ ও খেয়াল শ্রেণির গীত রচনার সূত্রপাত ঘটে। দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) প্রচলন করেন খেয়াল অঙ্গের বাংলাগান। পরবর্তীকালে রামশংঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) বাংলায় ধ্রুপদ সংগীত রচনার সূত্রপাত করেন। রামশংঙ্করের শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী যিনি অনেক বাংলা ধ্রুপদ রচনা করেন।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলে কৃষ্ণনগর থেকে বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০) এসে ব্রাহ্মসমাজে সংগীতাচার্যরূপে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৫০ বছর তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত থেকে ব্রহ্মসংগীতের একটি ধ্রুপদী ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হন। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সংগীতের ধারাতেও কিছুটা পরিবর্তন আসে তবে রামমোহন প্রবর্তিত সংগীত ঐতিহ্য থেকে সমাজ কখনো বিচ্যুত হয়নি।

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে আসেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরবর্তী সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করলে সেখানে ধ্রুপদীয় সংগীতাদর্শের পরিবর্তে কীর্তনীয় সংগীতাদর্শ প্রাধান্য পায়। তবে আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগীতির সাংগীতিকভিত্তি রয়ে গিয়েছিল প্রধানত ধ্রুপদ কেন্দ্রিক। আর জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগীত ধারাই পরিপুষ্ট লাভ করে এবং পরবর্তী সময়ে তাই রবীন্দ্রনাথের অত্যুজ্জ্বল আর্বিভাবের ফলে ধ্রুপদীয় সংগীতাদর্শ সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে মুঘল সাম্রাজ্যে দুর্দিনের ঘনঘটা শুরু হতে থাকে। দিল্লীর অনেক কলাবতজন তখন ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়তে থাকেন এবং অনেকেই বাংলায় আসেন। কলকাতা সেই সময় বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংগীত এবং সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রাচীন ও আধুনিক রাগসংগীতের যে সমস্ত তরঙ্গমালা বাংলাসংগীতে প্রবেশ করেছে সেগুলোই বাংলার নিজস্ব সংগীত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আত্মীকৃত হয়েছে। তবে নিধুবাবুর টপ্পা ও রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের ধ্রুপদ ও রঘুনাথ রায়ের খেয়াল প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলার হিন্দুস্তানী সংগীত প্রবাহের ধারা হিন্দুস্থানের নানা অঞ্চলে পুষ্প পত্রে পল্লবিত হয়ে বহু ঘরানার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হতে দেখা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে এবং রাগসংগীত চর্চার মধ্য দিয়ে বাংলাসংগীতে নবনব সুর সমাবেশ দেখা দেয়। সুরবৈচিত্র ও কাব্য মাধুর্যে বাংলাগান বিশিষ্টতা লাভ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯৩১), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৪-১৯১০), অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এই পঞ্চকবি ও সঙ্গীতজ্ঞদের সৃষ্টিশৈলীতে। এঁরা সকলেই হিন্দুস্তানী সংগীতের পথ ধরেই বাংলা কাব্য সংগীতের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং বাংলাগানের আধুনিক ধারার সূত্রপাত ঘটান। আবার লক্ষ্মৌ প্রবাসী অতুলপ্রসাদ ডুবেছিলেন ঠুমরীর কোমল মিহি জালে।

রবীন্দ্রনাথ কাব্যসংগীতের একটি উচ্চ আদর্শকে তাঁর গানে রূপায়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন কাব্যের গভীরে সুরকে টানছিলেন, হিন্দুস্তানী সংগীত তখন সুরের গভীরে মনকে টেনে নিচ্ছিল। তবে অল্পবিস্তর ব্যবধান আছে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের গানে। ঠিক এসময় বাংলাগানের জগতে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। সুরের উন্মাদনায় ও ছন্দের ঝঙ্কারে বীররসের এক গভীর শক্তিকে তিনি বাংলাগানে সঞ্চারিত করেন। সুর ও বাণীর এক অভূতপূর্ব মিশ্রণ এবং বিশুদ্ধ হিন্দুস্তানী সংগীতচর্চা ও হিন্দুস্তানী প্রভাবিত বাংলাগানের ধারা আনয়নে কাজী নজরুল ইসলাম এক বিস্ময়ের নাম।

কাজী নজরুল ইসলাম একাধারে যেমন রচনা করেছেন কীর্তন, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, জারি, সারি, মুর্শিদী, বাউল, রামপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত, ইসলামী গান, ঠুমরী, গজল, ধ্রুপদ, কাজরী, হোরী ইত্যাদি অন্যদিকে সেসব গানের সুরায়নে বিভিন্ন রাগ রাগিনীর সংযোগ ঘটিয়েছেন নিপুণ ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির আদলে। গানের ব্যাকরণবদ্ধ আলংকারিক আতিশয্য ত্যাগ করে বাংলাগানের বাণীরূপের সঙ্গে হিন্দুস্তানী সুরের পরিণয় সাধন করেছেন নজরুল।

নজরুলের সঙ্গীত রচনাকালকে চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। পর্বগুলি-
প্রথম পর্ব : ১৯২০ সালের মার্চের পর থেকে ১৯২৬ সালের নভেম্বর পর্যন্ত যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণ ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার স্বরূপ উদ্দীপনামূলক দেশাত্মবোধক গানের রচনাকাল।
দ্বিতীয় পর্ব : ১৯২৬ সালের নভেম্বরের পর থেকে ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পারস্য গজলের অনুপ্রেরণায় বাংলাগজলের রচনাকাল।
তৃতীয় পর্ব : ১৯২৮ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত গ্রামোফোন কোম্পানী, মঞ্চ ও চলচ্চিত্র কেন্দ্রিক বিভিন্ন আঙ্গিকের গানের রচনাকাল।
চতুর্থ পর্ব : ১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বেতারকেন্দ্রিক গান ও রাগসংগীত নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা মূলক বিবিধগানের রচনাকাল।

এ উপমহাদেশের সংগীতে তিনি একটি নতুন ও স্বকীয়ধারা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাংবাদিকতা ও পত্রিকা সম্পাদনার সাথে সাথে অনুবাদ সাহিত্যেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সংগীতজ্ঞ, গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, গল্পকার, উপন্যাসিক, অভিনেতা, শিল্পী, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক ও সম্পাদক।

বৈচিত্র কাজী নজরুল ইসলামের সংগীতকর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশাত্মবোধক, আধুনিক, গজল, রাগপ্রধান গান, ইসলামিক, ভক্তিমূলক, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, হাসির গান, ঋতুসংগীত, জাগরণীমূলক, মার্চসংগীত, বাউল, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, ঝুমুর, সাঁওতালী, কাজরী, ছাদ পেটানোর গান, গীতিনাট্যের গান, গীতি আলেখ্য, চলচ্চিত্রের গান ইত্যাদি তাঁর সব উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বৈচিত্র নজরুল সংগীতের

বাণীর বেলায় যেমন সত্য, তেমনি সত্য সুরের বেলায়ও। সংগীতের এতগুলি পর্যায়ে নজরুল যেভাবে বৈচিত্রময় সুর সংযোজন করেছেন, বাংলাগানের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত জীবন বহু বৈচিত্রময় অধ্যায় দ্বারা পরিবেষ্টিত। তাঁর সংগীতময় জীবন ও সাংগীতিক গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে জন্মলগ্ন থেকে তাঁর পারিবারিক জীবনধারা, কিশোরকাল, যৌবনকাল, তাঁর শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে নজরুলের জীবন প্রবাহ সন্নিবেশিত হলো।

১.২ কাজী নজরুল ইসলামের জীবনপ্রবাহ

কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষগণ পাটনার অন্তর্গত হাজীপুরে বাস করতেন। পরবর্তীকালে মোঘল সম্রাট শাহ্ আলমের সময় তারা হাজীপুর থেকে চুরুলিয়ায় এসে বসবাস স্থাপন করেন। এই চুরুলিয়ায় অস্ত্রাদি নির্মিত হত যা সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল। চুরুলিয়া ছিল রাজা নরোত্তম সিংহের রাজধানী। এই চুরুলিয়াতে কাল-বৈশাখীর ঝড়ের মত নূতনের কেতন উড়িয়ে আবির্ভাব ঘটেছিল কাজী নজরুল ইসলামের। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে মঙ্গলবার এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কাজী নজরুল ইসলাম। কবির পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ, মাতার নাম জাহেদা খাতুন, পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ, মাতামহ মুন্সী তোফায়েল আলী। নজরুলের ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। মাত্র ৮ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে পরেন তিনি। ১৯০৯ সালে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সেই সময় থেকেই জীবিকা নির্বাহের চিন্তা করতে হয় তাঁকে। এ কারণে তাঁকে মক্তবের শিক্ষকতা, মাজারে খাদেমগিরি এবং মসজিদে মুয়াজ্জিনের কাজ করতে হয়। শৈশবে পিতৃহীন হয়ে ঘোরতর দারিদ্র্যে নিপতিত হওয়ার কারণে পরিবারের অর্থনৈতিক কষ্ট এবং দৈন্য লাঘব করতেই এত অল্প বয়সে নজরুলকে বিভিন্ন রকম কাজের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।

চুরুলিয়ার সোদামাটির গন্ধ, এবড়োখেবড়ো রাস্তা, কাঁকড় বালি মেশানো মাটি, বনজঙ্গল, চোখজুড়ানো সবুজ শ্যামলিমা, সূর্যের প্রখর তেজ-এরকম প্রত্যন্ত অঞ্চলবেষ্টিত এক রাঢ়ভূমিতে কাজী নজরুল ইসলামের শৈশব ও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয়েছিল। শৈশব থেকেই নজরুল প্রত্যক্ষ করেছেন তাদের গাঁয়ে হিন্দু মুসলমানের সহাবস্থান, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ। সকলের মাঝে একটি বিষয় প্রকটভাবে ছিল আর তা হলো- আমরা মানুষ, আমরা এক জাতি- আর এই সামাজিক অবস্থা নজরুলের জীবনে যে কতটা প্রভাব ফেলেছিল সেটা নজরুলের সৃষ্টিকর্মের মাঝেই প্রত্যক্ষ ভাবে বিদ্যমান।

শিক্ষার আলো সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে চুরুলিয়ায় গড়ে উঠেছিল মক্তব। নজরুলের পিতৃব্য বজলে করিমের শিক্ষার আলোয় নজরুল শৈশবেই নিজের জীবনকে আলোকিত করতে পেরেছিলেন। এছাড়া নজরুলের পিতাও তাঁকে শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন। তবে বজলে করিমের প্রভাব নজরুলের জীবনে অনেকটা জায়গাজুড়ে। নজরুল অতি অল্প বয়সেই আরবী, ফারসি, উর্দু ও বাংলাভাষায় দক্ষ হয়ে ওঠেন। রামায়ণ মহাভারত সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করেছিলেন শৈশবেই। হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় ধ্যান

ধারণায় পুষ্ট হয়ে ওঠেন খুব অল্প বয়সেই আর এসবই সম্ভব হয়েছিল চাচা বজলে করিমের শিক্ষায়। কিশোর নজরুলের মনে ভাষার প্রতি ভালবাসার বীজ বুনে দিয়েছিলেন এই পিতৃব্য। লেটোর দলে গান, গদ্য রচনায় নজরুলের পারদর্শিতার পেছনে বজলে করিমের অবদান প্রকট।

চুরুলিয়া খুব বিত্তশালী গ্রাম না হলেও সেখানে ছিল মার্জিত রুচি সম্পন্ন ভদ্রসমাজ। নিয়মানুবর্তিতা ছিল গ্রামের ঘরগুলোতে। গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য মক্তব ছিল, ছিল শিক্ষিত মৌলবী আর শিক্ষিত লোকদের আনাগোনা। আর এই পরিবেশটা নজরুলকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। ছোটবেলা থেকেই নজরুল মেধাবী ছিলেন বলে জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর ছিল তীব্র পিপাসা। আর তাই কিশোর বয়স থেকেই নজরুল অনুভব করেছিলেন শিক্ষিত ও মার্জিত মনের মানুষ হলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব। ছোটবেলা থেকেই নজরুল ছিলেন ভাবুক প্রকৃতির। নীরবতা, একাকীত্ব খুব উপভোগ করতেন। এই উদাসীনতা নজরুলের ছেলেবেলার ভাবুক মনকে পুষ্ট করে,তাঁকে নিরাসক্ত হতে প্রেরণা যোগায় যার পরবর্তী প্রভাব নজরুলের সৃষ্টিকর্মের মাঝে লক্ষণীয়।

কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাজীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর পরিবারেই। পিতার নিকটই তিনি বাংলা অক্ষরের সাথে পরিচিত হন। কিন্তু অসময়ে পিতৃবিয়োগ ঘটায় এবং পরিবারের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা না থাকায় নজরুলের বিদ্যা শিক্ষার তেমন সু-ব্যবস্থা হয়নি। কিন্তু জ্ঞানার্জনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি স্বশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামের মক্তব থেকে ১৯০৯ সালে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মক্তবে পড়াকালীন সময়ই পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর নজরুল এ মক্তবেই শিক্ষকতা শুরু করে সংসারের হাল ধরেন। এরপর বেশ কিছুদিন তাঁর পড়াশোনায় ছেদ পরে। স্কুলের নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া হয়তো তাঁকে সেভাবে টানতো না। ১১/১২ বছর বয়সেই লেটোর দলে যোগ দিয়েছিলেন এবং লেটো দলেই তিন-চার বছর কাটিয়েছিলেন। লেটোর দল থেকে নজরুল আবার ফিরে যান বিদ্যালয়ে। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সহায়তায় মাথরুন নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউশনে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত-অর্থাৎ ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত স্কুলে পড়াশোনা করেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে সেখানে তিনি পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেননি।

স্কুল ছাড়ার পর নজরুল ইসলাম আবার লেটো দলে যোগ দেন। দলের জন্য গান রচনা করেন এবং নাচ-গান- অভিনয়ের জন্য তালিম দেন। এক গানের আসরে নজরুলের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে রেলের জনৈক গার্ড তাঁকে চাকরি দেন কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় সেটিও স্থায়ী হয়নি। পরবর্তীকালে আসানসোলে মুহম্মদ বখসের রুটির দোকানে কিছুদিন কাজ করেন। সেখানে তিনি বেচাকেনার ফাঁকে ফাঁকে বাঁশি বাজিয়ে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে ক্রেতাদের খুশী করতেন।

নজরুলের এরকম ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা তাঁর সৃষ্টিকর্মে সাহায্য করেছে। পরবর্তীসময়ে নজরুলের সাথে পরিচয় ঘটে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ ও তার পত্নী শামসুন নাহারের সাথে। এই দম্পতির গৃহে নজরুল কাজ কর্ম করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তারা এই বালকের কবিত্বশক্তি ও গান শুনে বুঝতে পারেন এই বালক কোন সাধারণ মানুষ নয়। তাদের ইচ্ছায় এবং নজরুলের আগ্রহে সাব ইন্সপেক্টর রফিজউল্লাহ সাহেব ট্রেন ভাড়া দিয়ে নজরুলকে তার দেশের বাড়িতে বড় ভাই সাফায়াতউল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেন এবং কাজী নজরুলের ময়মনসিংহ দরিরামপুর স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করেন।

দরিরামপুর স্কুলে নজরুল সপ্তম শ্রেণিতে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্তির সুযোগ পান। কিন্তু সেখানেও তাঁর অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ায় ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষা শেষ করে ত্রিশাল থেকে চুরুলিয়ায় ফিরে আসেন। সেই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বা দ্বিতীয় হয়ে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন বর্ধমান শহরের Albert Victor Institute স্কুলে। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে স্কুলটি উঠে যাওয়ায় তিনি বর্ধমান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এর কিছুদিন পরে সিয়ারসোল রাজস্কুলের নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষক এবং Albert Victor Institute এর প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সদয় অনুকূলে নজরুল ভর্তি হন রানীগঞ্জের সিয়ারসোল রাজস্কুলের অষ্টম শ্রেণিতে। এই স্কুল নজরুলের ভবিষ্যত জীবনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর মাঝে বিপ্লবী চিন্তাধারার সঞ্চারণ ঘটিয়েছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী যুগান্তর দলের নিবারণ চন্দ্র ঘটক। এছাড়া সিয়ারসোল স্কুলের আরো দু'জন শিক্ষকের প্রভাব ছিল নজরুলের উপর। এদের মাঝে আছেন মৌলবী হাফিজ নুরুন্নবী। বাল্যকালে যদিও আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার জানা হয়েছিল পিতৃব্য বজলে করিমের কাছে কিন্তু প্রথাগতভাবে ফারসী শেখার সুযোগ হয়েছিল এই নুরুন্নবীর কাছেই। নুরুন্নবী অতি যত্ন সহকারে নজরুলকে ফারসী ভাষার সাথে পরিচয় করিয়েছিলেন। ফারসী ভাষা খুব ভালভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন বলেই করাচির সেনানিবাসে মৌলবী সাহেবের কাছে পারস্যের মরমী কবি হাফিজের রুবাইয়াৎ গ্রন্থটি পড়া নজরুলের সহজ হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া আরেকজন শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীত ও সাহিত্যে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল এবং রাগসংগীতে যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। সতীশচন্দ্রের কাছে নজরুল রাগসংগীতের বেশ কিছু পাঠ গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে রাগসংগীতের এক দিকপাল হয়ে উঠেছিলেন।

ডঃ রফিকুল ইসলাম নজরুলের ছাত্রজীবন সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> "নজরুল মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে, দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে, আর সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণীতে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনীতে যোগদান অবধি।"[১]

১৯১৭ সালের মাঝামাঝি নজরুল ইসলাম সেনাবাহিনীতে যোগদান করার পর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্রজীবনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ে যায়।

---

[১] রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা, ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮২, পৃ : ১৮

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য মনোনীত হবার পর প্রশিক্ষণের জন্য তাঁকে কলকাতা থেকে নওশেরা নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক সামরিক শিক্ষার পর তাকে নেয়া হয় করাচিতে। সেনাবাহিনীটি বিশেষত কয়েক হাজার বাঙালি হিন্দু-মুসলমান তরুণের সমন্বয়ে গঠিত হওয়ায় তা '৪৯ নম্বর বাঙ্গালি রেজিমেন্ট' বলেই পরিচিত ছিল। সেনা মহড়ার দিনগুলোর প্রতিচ্ছবি নজরুলের জীবনে যে প্রভাব ফেলেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে ২/৩ বছর পরের সৃষ্টি 'অগ্নিবীণা' ও 'কামাল পাশা'।

নজরুল সামরিক জীবনের প্রায় পুরোটা সময় করাচিতে কাটান এবং এখানে কর্মরত অবস্থাতেই তিনি ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে উন্নীত হন। বাঙালি পল্টনে কয়েকশো তরুণের প্রাণোচ্ছলতা ও উন্মাদনার অন্ত ছিল না। পরবর্তীকালে নজরুলের সৃষ্টি 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে এই করাচি যুদ্ধজীবনের প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। সামরিক জীবনের স্থির নিয়মবদ্ধ জীবনযাপন নজরুলকে তাঁর সাহিত্য সাধনার এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের জন্য চমৎকার সুযোগ এনে দিয়েছিল। সাহিত্যিক জীবনের উদ্বোধন যেন সৈনিক জীবন থেকেই। রুবাইয়াৎ -ই- হাফিজ এর মুখবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন-

> "আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি সে আজ ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের কথা। সেইখানে আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবি মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতগুলো কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে সেইদিন থেকে তাঁর কাছে ফারসি শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফারসি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্যই পড়ে ফেলি।"[২]

করাচি সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্যচর্চা শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য সম্বলিত সাহিত্য সম্ভারের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না, কলকাতার সাহিত্য জগতের সাথেও ছিল তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। 'সওগাত' পত্রিকার প্রকাশলগ্ন থেকে নজরুল তার গ্রাহক ছিলেন এবং কিছু গ্রাহক নিজেও সংগ্রহ করে দেন।

করাচি থেকে নজরুল নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন সাহিত্য সাময়িকীতে লেখা পাঠাতেন যা 'হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম' নামে ছাপা হত। করাচিতে লেখা এবং করাচি থেকে পাঠানো নজরুলের নিম্নলিখিত রচনাসমূহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়-

১. 'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী' (গল্প) সওগাত, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬
২. 'মুক্তি' (কবিতা) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৬
৩. 'স্বামীহারা' (গল্প) সওগাত, ভাদ্র ১৩২৬
৪. 'কবিতা সমাধি' (হাসির কবিতা) সওগাত, আশ্বিন ১৩২৬
৫. 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (প্রবন্ধ) সওগাত, আশ্বিন ১৩২৬
৬. 'হেনা' (গল্প) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কার্তিক ১৩২৬
৭. 'আশায়' (হাফিজের গজলের ভাবানুবাদ) প্রবাসী, পৌষ ১৩২৬
৮. 'ব্যথার দান' (গল্প) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৬

[২]রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ : ৪৬, ৪৭

৯. 'মেহের নেগার' (গল্প) নূর, মাঘ, ফাল্গুন ১৩২৬

১০. 'ঘুমের ঘোরে' (গল্প) নূর, ফাল্গুন ১৩২৬[৩]

করাচি ব্যারাকেই নিত্যানন্দ দে, গোপী, মনিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহকর্মীর সাহচর্যে অরগ্যান, কর্নেট, ক্ল্যারিওনেট, ব্যাঞ্জো ইত্যাদি যন্ত্রবাদন সম্পর্কে নজরুল অবহিত হন। ব্যারাকেই তিনি সামরিক সংগীতের সঙ্গে পরিচিত হন যার মধ্যে মার্চ সংগীতের ঢং তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে যা পরবর্তীকালে মার্চ সংগীতের ঢঙে দেশাত্মবোধক গান রচনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই নজরুলের সাথে পরিচয় ঘটেছিল একজন পাঞ্জাবী মৌলবীর যার মাধ্যমেই দীওয়ান-ই-হাফিজ এর সাথে নজরুলের সংযোগ ঘটেছিল এবং তিনিই নজরুলের মনে মধ্য প্রাচ্যের বিখ্যাত সব কবিদের রচনার বীজ বপন করেছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে নজরুল ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করেন যা পরবর্তী সময়ে নজরুলকে বাংলাসংগীতে গজলের প্রবর্তক হওয়ার ক্ষেত্রে অনেকাংশে সাহায্য করেছিল। মোটকথা সৈনিক জীবনই নজরুলকে দিয়েছিল একটা স্থিতিশীল জীবন যা তাঁর মধ্যে এক নতুন জীবনবোধের জন্ম দেয়, জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছতা দেয়।

সাহিত্য হল প্রাণের অভিব্যক্তি আর সাহিত্যের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ ঘটে। কাজী নজরুল ইসলামের এই উপলব্ধি থেকে সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বিষয়টি সহজে উপলব্ধি করা যায়। তাঁর কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতা ও প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যের এক নতুন ভাবধারা আনয়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

'বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী'-র মাধ্যমে সাহিত্য জীবনে নজরুলের আত্মপ্রকাশ ঘটে যা মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিনের সম্পাদনায় 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর একে একে অসংখ্য গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনার মাধ্যমে কাজী নজরুল ইসলাম সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন নজরুলের এই লেখাগুলি তখনকার বিখ্যাত সওগাত, সংগীত মুসলমান সাহিত্য ও নূর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যা জনাব মুজাফ্ফর আহমদের হাতে পড়েছিল। আর মুজাফ্ফর আহমদই নজরুলকে সাহিত্য চর্চায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১৩২৬ বঙ্গাব্দে কলকাতায় ফেরার পর এবং করাচি থাকাকালীন যেসব সাহিত্য রচনা করেছিলেন তার বেশির ভাগ ছিল দেশের সামগ্রিক অবস্থার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ, সোচ্চার কণ্ঠস্বর। নজরুল ইসলাম যতদিন সুস্থ ছিলেন ততদিনই সাহিত্য ও সংগীত চর্চায় ব্রত থেকে তা কখনো কবিতা, কখনো প্রবন্ধ, কখনো উপন্যাস, নাটক আবার কখনো বা তার অতুলনীয় সংগীত সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন। সৃষ্টির মাঝেই তিনি আনন্দ পেতেন, শৃঙ্খলিত জীবনে তাঁকে কখনোই বেঁধে রাখা সম্ভব হয়নি। বাঁধভাঙা জোয়ারের মত তিনি একের পর এক সৃষ্টি করে গেছেন তাঁর অসাধারণ সব সাহিত্য সম্ভার।

[৩]রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩, পৃ : ৪৮

কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার সার্থক স্ফূরণ ঘটেছে সংগীতের ক্ষেত্রে। নজরুল ছিলেন মূলত স্বভাব গীতিকবি। সংগীত জগতে তাঁর অনুপ্রবেশ লেটো দলের মধ্য দিয়েই। নজরুলের পিতৃব্য কাজী বজলে করিমের কাছেই তাঁর এক প্রকার হাতেখড়ি হয়। কাজী বজলে করিম ছিলেন নিমশা গ্রামের সেই লেটোদলের পরিচালক। লেটোদলের জন্য গান বাধা, পালা রচনা করা, আসরে দাঁড়িয়ে দল পরিচালনা করা সবকিছুর হাতেখড়ি হয় বজলে করিমের কাছে। লেটো দলে নতুন নতুন গান বেঁধে, তাতে সুর সংযোজন করে নজরুল রাতারাতি দলের একজন প্রধান হয়ে ওঠেন। কাজী বজলে করিমের মৃত্যুর পর নজরুল ইসলাম এই দলের হাল ধরেন। তৎকালীন বিখ্যাত লেটো পরিচালক শেখ চকোর গোদাও তাঁকে স্বস্নেহে লেটোর জন্য পাঠ দিতেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লেটোদলের কবিরূপে নজরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। তৎকালীন সময়কার নজরুল জীবনের একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন মিলন দত্ত-

> "শেখ চকোর গোদা এবং মুন্সী বজলে করীমের প্রভাবে নজরুল লেটোর জন্য গান লিখে দিতে লাগলেন। তাঁর লেখা দারুন জনপ্রিয় হয়ে উঠল। গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল কিশোর কবির নাম । বিভিন্ন গ্রাম থেকে তাঁর কাছে লোক আসতে লাগল গান লিখিয়ে নেবার জন্য। আর নজরুলও মুক্তহস্ত। যে এসে গান চায়, তাকেই তিনি গান লিখে দেন। আরবি, ফার্সি, বাংলা, ইংরেজি শব্দ ও বাক্য মেশানো গানও তাঁকে লিখতে হতো। পরবর্তীকালে নজরুল এক অসাধারণ সংগীত রচয়িতা ও সুরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একদিনে এক সঙ্গে চৌদ্দ পনেরটি গান লিখে, তাতে সুর দিয়ে এবং তা সকলকে শেখানোর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার মূল উৎস ছিল লেটোর দলের জন্য বিচিত্র অসংখ্য গান রচনার মধ্যে। এর মধ্যে তিনি খুঁজে গেলেন প্রাণের আরাম, মনের তৃপ্তি।"[৪]

লেটোদলের জন্য গান ও পালা রচনা করতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের পরিচয় ঘটে হিন্দু ও মুসলিম উভয় জীবনধারার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে যা পরবর্তীকালে তাঁর রচনায় প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়া লেটোর দলের সুবাদে তিনি বর্ধমান অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির সঙ্গেও পরিচয়ের সুযোগ পান এবং ঝুমুর গান সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত হন। এ সময়ই নজরুল বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাজানো শিখেছিলেন।

সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে নজরুলের নিষ্ঠা এবং মনোনিবেশ ছিল অনেক বেশি যদিও তিনি সংগীত শিক্ষা ও রচনার তরীটিকে কখনো একই ঘাটে বেঁধে রাখেননি। সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে থাকাকালে ঐ স্কুলের শিক্ষক শ্রী সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলালের কাছে নজরুলের উচ্চাঙ্গ সংগীতে হাতেখড়ি হয়। আবার হুগলিতে থাকাকালীন বিখ্যাত সেতারবাদক প্রকৃতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কিছুদিন সেতারে তালিম নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে করাচি থেকে কলকাতায় চলে আসার পর নজরুল সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি দেশাত্ববোধক, উদ্দীপনামূলক, জাগরনীমূলক, স্বদেশ চেতনামূলক অসংখ্য গান রচনা করেন। এরপর কিছু দিন মার্গ সংগীতে তালিম নেন মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের কাছে এবং তৎকালীন খেয়াল ও ঠুমরীর প্রখ্যাত ওস্তাদ জমীরউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে। পরবর্তীকালে নজরুল রাগসংগীতের এক মহাভান্ডারী হয়ে উঠেছিলেন যার স্বাক্ষর তাঁর গানেই পাওয়া যায়।

---

[৪]ডঃ মিলন দত্ত, নজরুল জীবনরচিত, কলিকাতাঃ প্রসাদ লাইব্রেরী, ১৯৭৬, পৃ: ২২

কাজী নজরুল ইসলামকে কবি, সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে জেনে থাকলেও সাংবাদিকতা এবং সম্পাদনায় তিনি যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয়েছে। অত্যন্ত ক্রান্তিকালীন সময়ে সাংবাদিকতার জগতে নজরুলের আবির্ভাব ঘটে। নজরুল ইসলামের সাংবাদিকতা শরু হয় ১৯২০ সালের মধ্যভাগে এবং শেষ হয় ১৯৪১ সালে নবযুগ দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্পদনার সময়।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুলাই কাজী নজরুল ইসলাম এবং মুজফ্ফর আহমদ দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। যুদ্ধোত্তর ভারতে অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের ফলে যে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে 'নবযুগ' পত্রিকা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে। কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষুরধার লেখনীর গুণেই 'নবযুগ' পত্রিকা জনপ্রিয় হয়েছিল। নজরুলের লেখাগুলোর শিরোনাম হতো অতুলনীয়। পূর্বে কোন দৈনিক কাগজের অফিসে কাজ করার অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও বড় বড় খবর গুলো সংক্ষেপ করার জন্য এক অত্যাশ্চর্য কৌশল তিনি রপ্ত করেছিলেন যা অনেক দক্ষ সাংবাদিকরাও আয়ত্ত্ব করতে হিমশিম খেয়ে যেতেন। এসময় নজরুলের বেশ কিছু কবিতা প্রকাশিত হয়। সমগ্র বাংলাদেশে নজরুলের কবি প্রতিভা ও সাংবাদিক প্রতিভা ছড়িয়ে পড়তে থাকে কিন্তু রাজরোষে 'নবযুগ' বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় যদিও পরবর্তীকালে আবার 'নবযুগ' প্রকাশিত হয়েছিল। সেসময় নজরুল ধুমকেতু, লাঙ্গল, গণবাণী, সেবক ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকার সাথে যুক্ত হন এবং সম্পাদনার কাজও চালিয়ে যান। পত্রিকার সফলতা, সত্যনিষ্ঠ সংবাদ এবং নিজস্ব মতবাদ দ্বারা পাঠকশ্রেণিকে আকৃষ্ট এবং অনুপ্রাণিত করাই ছিল নজরুলের সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য। সাংবাদিকতা যে একটি মহৎ পেশা যা কর্তব্য ও ন্যায়পরায়ণতা, নির্ভীকতা ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত-তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিল কাজী নজরুল ইসলামের সাংবাদিক জীবন।

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে সমগ্র বাঙ্গালি জাতির পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন এস. ওয়াজেদ আলী। সভাপতির ভাষণ শেষে এস. ওয়াজেদ আলী অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন এবং শেষে সভাপতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কবিকে সোনার দোয়াত কলম ও রূপার আধারে অভিনন্দন পত্র উপহার দেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' প্রদান করা হয়। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক কবি 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলামকে ভারত থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁকে জাতীয় কবির মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নজরুলকে ডি. লিট উপাধি প্রদান করা হয়। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুলকে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করেন এবং ঐ বছরই তাঁকে বাংলাদেশের সবচেয়ে সম্মানসূচক একুশে পদক প্রদান করা হয়।

নবযুগে সাংবাদিকতার পাশাপাশি নজরুল বেতারে কাজ করছিলেন। এমন সময় অর্থাৎ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তবে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁর অসুস্থতা সুস্পষ্টরূপে জানা যায়। এরপর তাঁকে মূলত হোমিওপ্যাথি এবং আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করানো হয়। এতে অবস্থা তেমন উন্নতি না হওয়ায় তাঁকে ইউরোপে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নিউরো সার্জারির জন্য কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিভৃত থাকার পর কবি ও কবি পত্নিকে রাঁচির একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। এই উদ্যোগে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল নজরুলের আরোগ্যের জন্য গঠিত একটি সংগঠন যা 'নজরুল নিরাময় সমিতি' নামে পরিচিত ছিল। এছাড়া তৎকালীন ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সহযোগিতা করেছিলেন।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে নজরুল ও প্রমীলা দেবীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডন পাঠানো হয়। সেখানে পৌঁছাবার পর নজরুলকে পরীক্ষার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড বসে। ডা. উইলিয়াম সার্জেন্টের প্রাথমিক পরীক্ষা কালে প্রকাশ পায় যে কবির আরোগ্য লাভের বিশেষ আশা নেই। তবে মেডিকেল বোর্ডের অপর দুজন সদস্য অবশ্য ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। স্যার রাসেলের মতে কবির মস্তিষ্কের সেল এতোটা নষ্ট ও সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল যে তা ছিল আরোগ্যের বাইরে। লন্ডনের একদল চিকিৎসক বলেছিলেন যে কবি 'ইনভলুশনাল সাইকোসিস' রোগে ভুগছেন। অতঃপর কবিকে ভিয়েনায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডা. হানস হফ্ জানান যে কবি 'পিক্স ডিজিজ' নামক মস্তিষ্কের রোগে আক্রান্ত এবং তাঁর আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর কবি ও কবিপত্নীকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। লন্ডন ও ভিয়েনার সমস্ত মেডিকেল রিপোর্ট রাশিয়ায় বিশেষজ্ঞদের কাছেও পাঠানো হয়েছিল তবে তারাও জানান যে নজরুলের আরোগ্যের ব্যাপারে তাদের বিশেষ কিছু করার নেই ফলে নজরুল আমৃত্যু জীবনমৃত ও সম্বিতহারা অবস্থায় এক মর্মান্তিক জীবনযাপন করেছেন।

১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯ আগষ্ট, ১৩৮৩ বঙ্গব্দের ১২ ভাদ্র রবিবার সকাল ১০টা ১০ মিনিটে ঢাকার তৎকালীন পিজি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আমাদের প্রাণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে বজ্রাহত হয়ে যায় বাঙালি জাতি। সেদিনই সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবিকে তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত স্থান মসজিদের পাশে অর্থাৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে সমাহিত করা হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের সনাতন ধর্মীয় চিন্তা

কোন বস্তু বা জীবের সত্তাগত বৈশিষ্ট্য হল ধর্ম। সংস্কৃত ধৃ-ধাতু থেকে 'ধর্ম'-শব্দটির উৎপত্তি যার অর্থ ধারণ করা। আবার বলা যায় যে অভিজ্ঞানে স্নাত হয়ে জীবকুল শান্তির মোহনায় অবগাহন করে তাই ধর্ম। তবে প্রচলিত ধর্ম কতখানি মানুষকে ধারণ করতে পারছে বা শান্তিধারা ছড়িয়ে দিতে পারছে তা নিয়ে মতবাদ বা মতবিরোধের অন্ত নেই। কারণ প্রতিটি ধর্মেই আছে মানবপ্রেম আর শান্তির কথা, আছে মানুষকে সর্বাগ্রে স্থাপনের কথা কিন্তু তবুও মানবতা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত, ধর্মের নামে হানাহানি চলছে জগৎজুড়ে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রীতি আর ভ্রাতৃত্ববোধে উজ্জীবিত এক মহান পথ প্রদর্শকের নাম উঠে আসে, তিনি হলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুল তাঁর ব্যক্তি অনুভূতি এবং সৃষ্টিকর্ম দিয়ে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষের মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছেন। শত নিরাশার মধ্যেও উজ্জ্বল প্রাণের দীপ্ত আশাবাদের নব বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার বিবর্তনে দরিরামপুর ত্রিশাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু এবং সংসারে একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি এই দু'য়ের সমন্বয় নজরুলের জীবনকে একদিকে সংগ্রামবহুল অন্যদিকে শৃঙ্খলাহীন করে দিয়েছিল। তাঁর চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাণোতোষ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-

> "কোন অব্যক্ত চাঞ্চল্যে জীবনব্যাপী কী মহৎপ্রাণকে যে খুঁজেছিলেন তা কেউ বুঝলনা। যখন খেয়াল হতো, সেই খেয়ালের শেষ দেখা ছিল তাঁর স্বভাব। এই স্বভাব তাঁর ছেলেবেলাও ছিল।"[৫]

দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে বড় হওয়া শিশু কিশোরের মনে ধর্মজ্ঞান গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে না,তবে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদপুষ্ট এবং বিশেষায়িত সন্তান হওয়ায় নজরুলের মনে ধর্মজ্ঞান গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছিল। দরিদ্রতায় পিষ্ট জীবনে এ অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য তাঁর ছিল অবিরাম সংগ্রাম। সেজন্য নজরুল কখনো হিন্দু, কখনো মুসলমান ধর্মের রীতি-নীতিকে নানা রকম কঠোর আচরণের মাধ্যমে লাভ করতে চেয়েছিলেন। দশ বছর বয়স থেকে দারিদ্র্যের কষাঘাত এবং ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নজরুলকে মোল্লাগিরি, মসজিদের ইমামতি, রুটির দোকানে চাকুরী সবই করতে হয়েছে এবং সে সূত্রে তাঁর জীবনে আসে দরিরামপুর ত্রিশালপর্ব। এ সময় থেকেই নজরুল খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন গ্রামবাংলার পল্লি প্রকৃতি, ক্ষুধার্ত, নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, তাদের জীবনযাত্রা, ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কার। এ সময়ই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগদান সূত্রে নজরুলের জীবনে আসে করাচিপর্ব যা তাঁর মানসগঠন অনেকাংশে বদলে দিয়েছিল। এখানে তিনি পরিচিত হলেন ফার্সি কবি ওমর খৈয়াম, রুমি, হাফিজের কবিতা এবং তাঁদের জীবনাদর্শনের সঙ্গে। তাঁরা প্রচলিত ধর্মের মধ্যে থেকেও মানবধর্মকে বড় করে দেখেছেন, জীবনের অমোঘ সত্যকে উদযাপন করেছেন। পরমত সহিষ্ণুতা, সংস্কারমুক্তি ও প্রথানুগত্যের বাইরে গিয়ে জীবনকে যাপন করার প্রণোদনা তিনি পেয়েছিলেন এঁদের কাব্য ও দর্শন থেকে। এছাড়া

[৫] প্রাণোতোষ চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম: (প্রথম খন্ড) দেবদত্ত কোম্পানি, কলকাতা

পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং কোরানের মূল বক্তব্য তাঁর জীবন ও মর্মে নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে এক মরমীয়ার পদে তাঁকে অধিষ্ঠিত করে। এভাবে তাঁর মানসলোকের সমৃদ্ধি বা শ্রীবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল অল্প বয়সেই এবং তা হয়েছিল ধাপে ধাপে এক সামগ্রিক ঐক্যসূত্রে। শৈশবে লেটোদলে গান গাওয়ার মধ্যে দিয়ে হিন্দুধর্মীয় এবং ইসলামের নানা চিন্তাকে কেন্দ্র করে গান রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সেই উদার চিন্তাধারার মানসভূমি রচিত হয়েছিল। লেটোগান সম্পর্কে অরুণ কুমার বসু বলেন-

> "লেটোগান এক জাতীয় নৃত্য-অভিনয় গীত বহুল পালাগান, যাতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উৎকর্ষ বিচারের রীতিটি কবি-আখড়াই যুগেই স্মারকমাত্র। এ গানে সমকালীন ঘটনা ও ইতিহাস পুরাণ সবেরই সহাবস্থান।"[৬]

এই সংস্কৃতিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে লেটোগান, কবিগান রচনার মাধ্যমে নজরুলের সৃষ্টি প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। আল-কোরআন, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত-এর কাহিনী তুলে এনে জনচিত্তে আকর্ষণীয় শব্দ প্রয়োগ পূর্বক ছন্দকে ভেঙে-চুরে দ্রুত গান ও কবিতা রচনায় তিনি দক্ষ হয়ে ওঠেন। এ গানের দলের উদার, অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে নজরুল বেড়ে ওঠেন। শুধু তাই নয়, সে সময় তিনি অনেক সাধু, সন্ন্যাসী, ফকিরদের সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং বিভিন্ন ধর্মালোচনায় যোগদান করতেন। নজরুলের রচনাকালে যে কয়টি লেটো পালার পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে সেগুলো সবই হিন্দু পুরাণ ও সংস্কৃতি বিষয়ক। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শকুনি বধ, মেঘনাদ বধ, দাতা কর্ণ, যুধিষ্ঠির, কবি কালিদাস, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, চাষার সঙ, রাজপুত্র, ঠগপুরের সঙ, আকবর বাদশা ইত্যাদি। আর এগুলোতে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। সেই থেকেই সূচনা হয়েছিল তাঁর বিভিন্ন ধরনের গান রচনার। তাঁর মানস গঠনে পারিবারিক প্রভাবের চেয়ে আবহমান বাংলার উদার সংস্কৃতিই বেশি প্রভাব ফেলেছিল। নজরুলের বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ বলেন-

> "আমি সেই নজরুলকে চিনি যে নজরুল পাশের গ্রামের বাসন্তী পূজার সময় ভাঙা একটা পাঁচিলের উপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে নজরুল লেটোর দলে বসে বসে ঢোলক বাজাচ্ছে, যে নজরুল সুর করে রামায়ণ, মহাভারত পড়ছে।"[৭]

এই কিশোর বয়সে লোকশিল্পী দলের সংস্পর্শে এসে তাঁর চরিত্রে সর্বজনীন ঔদার্যের পরিস্ফুটন ঘটে। এজন্যই কীর্তন, কথকথা ও গানের আসরে তাঁর উপস্থিতি ছিল প্রায় অবধারিত। এমনকি মৌলভীদের আল-কোরআন এর ব্যাখ্যা এবং মিলাদ শরীফেও নজরুল আগ্রহ রাখতেন। কথায় কথায় কোরআন-পুরাণের ব্যাখ্যা, আখ্যানের মালায় গেঁথে তত্ত্বকথা পরিবেশন, লৌকিক যুক্তিবাদের দ্বারা কোন বিষয়কে অমোঘ-অনুধাবনীয় করে তোলা-এগুলো যেন লেটো গানের শিকড় -বাকড় থেকেই এসেছিল। পুরাণ, কোরআন, গীতা, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ইসলামি পুঁথিপত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে অনায়াসে উপকরণ সংগ্রহের এই দক্ষতা নিতান্ত কৈশোরেই তিনি অর্জন করেছিলেন। নজরুলের জন্ম ও জন্মোত্তর বেড়ে ওঠা ভূগোল, পরিচিত পরিবার পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, নগ্ন ও নিষ্ঠুর জীবনবাস্তবতা, উত্তপ্ত দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনীতি তাঁর মানসলোক সংগঠনে শুধু অনুরণন বা কম্পনরূপ দোলই দেয়নি, বরং দিয়েছে কঠিন

---

[৬]অরুণ কুমার বসু, নজরুল জীবনী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১/১ আচার্য, জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা৭০০০২০, প্রকাশকাল: ২০০০, পৃ: ৭।

[৭]অরুণ কুমার বসু , নজরুল জীবনী, পূর্বোক্ত, পৃ: ৮

ধাক্কা। সে ধাক্কায় টিকে থাকা যেখানে ছিল দুরূহ, নজরুল সেখানে শুধুমাত্র যে টিকে থাকলেন তা নয়, বিবিধ চড়াই উৎড়াই চোরাবালি পেরিয়ে পেলেন এক প্রাণ সঞ্জীবনী সুধা। সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য যিনি আজীবন কলম ধরেছেন, তাঁকেও সাম্প্রদায়িকতার দুষ্টু রশিতে বাঁধার অপচেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু নজরুল নিবিষ্টচিত্তে সাধনার মাধ্যমে মানবতার জয়গান গেয়েছেন। যখন সামাজিক দ্বন্দ্ব ও জাতিবিদ্বেষে বাঙালি সমাজ প্রায় জরাজীর্ণ, মুক্তবুদ্ধির চর্চা অদৃশ্য, ধর্ম নিয়ে সংঘাত এবং উদারতা ও মানবিকতা যখন পর্যবসিত সেই প্রতিকূল পরিবেশেও নজরুল ছিলেন ঐক্য ও সাম্যের সাধনায় নিয়োজিত, শুভবুদ্ধির আদর্শে সমর্পিত। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন অপ্রকাশিত সত্যকে প্রকাশ করার জন্য এবং অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্ত রূপ দেয়ার জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত দূত। তাঁর ভাষায়-

> "আমি পরম আত্মবিশ্বাসী। তাই যা অন্যায় বলে বুঝেছি, তাকে অন্যায় বলেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কাহারো তোষামদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রসাদের লোভে কাহারো পিছনে পোঁ ধরি নাই, আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে তাঁর জন্য ঘরে বাইরের বিদ্রুপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, আপন ভগবানকে হীন করি নাই, নিজের সাধনালব্ধ বিপুল আত্মপ্রসাদকে খাটো করি নাই, কেননা আমি যে ভগবানের প্রিয়, সত্যের হাতের বীণা; আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্য দ্রষ্টা ঋষির আত্মা।"[৮]

কবির এই স্বরূপ সম্ভাষণ থেকে নিশ্চিত উপলব্ধি হয় তাঁর কাব্যিক মূল্যবোধ, প্রত্যয়, বিশ্বাস, প্রতিশ্রুতি আর অহম, ক্রন্দন যেখানে সমূলে প্রোথিত। এই মূল্যবোধ আর বিশ্বাসে নজরুল ছিলেন অটল, তাই তাঁর শিল্পী মানস আর ব্যক্তি মানসে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-স্ববিরোধ চোখে পড়ে না। কবি তাঁর আরাধ্য সত্যকে ঘরে বাইরে, কায়-মনো-বাক্যে সমানভাবে গ্রহণ করেছেন, সতত-ই সমুন্নত রেখেছেন। সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতো কবি তাঁর সময় সমাজ জীবনাভিজ্ঞতা সঞ্জাত অর্জিত জ্ঞানকে রূপবদ্ধ করেছেন তাঁর সৃজিত নব্য নন্দনতত্ত্বে।

কাজী নজরুল ইসলাম সমস্ত গোঁড়ামী, কুসংস্কার আর রক্ষণশীলতার মূলে কুঠারাঘাত করেছেন। তাঁর সংগীত এবং সাহিত্য কর্মের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে এসব রক্ষণশীলতা এবং গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তিনি সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছেন সমস্ত জরাজীর্ণ আর কুসংস্কারকে তাঁর লেখনী দিয়ে। তরবারির আঘাতের চেয়ে তিনি কলমকে অধিক শক্তিশালী মনে করতেন আর তাইতো প্রাসাদ এবং পর্ণকুটিরের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখেন নি। রক্ষণশীলতার তীব্র গোড়ামিতে যে মুসলিম সমাজ আচ্ছন্ন হয়েছিল; গান শোনাকে এবং করাকে হারাম বা নিষিদ্ধ মনে করত সেই মুসলমান সমাজে সংগীত স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন তিনি। স্বত:স্ফূর্ত নতুন সুরের সাধনায় এবং ইসলামিক ঐতিহ্য ও কোরানকে সহযাত্রী করে রচনা করেছিলেন অসংখ্য ইসলামিক গান। জন্মসূত্রে ইসলাম ধর্মকে মনের মাঝে ধারণ করায় ইসলামিক গান রচনা হয়তো সহজাত এবং অনেকাংশে সহজ ছিল। কিন্তু সহজ ছিল না একজন মুসলিম হয়ে সনাতন ধর্মের সমস্ত অনুষঙ্গ, ঐতিহ্য, মিথ কে একীভূত করে সনাতন ধর্মীয় গান রচনা। সেই

[৮]কাজী নজরুল ইসলাম, 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' নজরুল রচনাবলী ১ম খন্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, নজরুল জন্মশতবর্ষ সংস্করণ ২০০৬

কাজটা কাজী নজরুল ইসলাম খুব সহজে এবং স্বত:স্ফূর্তভাবে করেছিলেন। শুধু তাই নয় সনাতন ধর্মীয় গান রচনার ক্ষেত্রে তাঁর মত পারদর্শীতা পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে হয়তো আর কেউ দেখায়নি। তিনি মানুষের মনোজগতে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটালেন সম্পূর্ণ নীরবে। সনাতন ধর্মীয় গান বা সনাতন ধর্মীয় ভক্তিগীতি ও প্রার্থনা সংগীত রচনায় এক আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন। নজরুলের এই মুক্তমনন ও স্বচ্ছদৃষ্টি গড়ে ওঠার মূলে সাম্যবাদী আদর্শের একটা বড় ভূমিকা ছিল। নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারায় শাশ্বত ধর্মবিশ্বাস ছিল না।[৯] কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিকের চেয়েও গভীর এবং নিবিড় একাগ্রতাবোধে জড়ানো ছিল তাঁর সৃষ্টিগুলো। সে কারণে অনেকেই হয়তো নজরুলকে একজন খাঁটি মুসলমান কিংবা সৎ, নিষ্ঠাবান হিন্দুত্বে জড়াবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আর এই এক হয়ে মিশে যাবার সক্ষমতা, এমন বিবর্তন ঘটানো কাজী নজরুল ইসলামের পক্ষেই হয়তো সম্ভব হয়েছিল। চিন্তার গভীরে বিলীন হয়ে একজন শিল্পী হৃদয় যতোটা পৌঁছাতে পারে, অনেকক্ষেত্রে একজন বিশ্বাসী মানুষও ততোটা পারে না। এ কারণেই হিন্দু ধর্মীয় সংগীত বা ইসলামি সংগীত রচনার ক্ষেত্রে কেউ তাঁর চেয়ে গভীরে পৌঁছাতে পারেননি। চিন্তার গভীরতা এবং সূক্ষ্মতাকে এমন বাস্তব রূপে, মানুষের মাঝে তুলে ধরার প্রয়াস হয়তো প্রথম দেখিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সেজন্য একজন শিল্পীকে তথা কবিকে ধর্মীয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করলে তাঁর শিল্পসত্তা এবং শৈল্পিকবোধ অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

নজরুল তাঁর সৃষ্টি সর্ম্পকে বলেছেন-

> "মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে আমার কবিতার সাথে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সব দেশের, সব কালের এবং সব জাতির । কবিকে হিন্দু কবি, মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এতো ভুলের সৃষ্টি। আমি আপাতত এইটুকু বলে রাখি যে, আমি শরীয়তের কথা বলিনি, আমি কবিতা লিখেছি। ধর্মের বা শাস্ত্রের মাপকাঠি দিয়ে কবিতাকে মাপতে গেলে ভীষণ হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। ধর্মের বাড়াবাড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচে না, জন্মলাভও করতে পারে না। তার প্রমাণ আরব দেশ,ইসলাম ধর্মের কড়া-কড়ির পর থেকে আর যেথা কবি জন্মিল না।"[১০]

তিনি আরো বলেছেন-

> "সঙ্গীত, শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সব বিধি নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়। আজ বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে একজন চিত্রশিল্পী নাই। ভাস্কর নাই; সঙ্গীতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জা আর কি আছে? এ সবে যাহার জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোড়া সমাজ তাহাদের টুটি চিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা আর্টে বাঙ্গালি মুসলমানদের দান বলিয়া কোন কিছু থাকিবে না। পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাইরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষো একটি মহীরুহ অনেক বড় শ্রেষ্ঠ।"[১১]

---

[৯]তাহা ইয়াসিন, নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০১৩, পৃ-৩৯০

[১০]আনওয়ার হোসেনকে লেখা (২৩ শে অগ্রহায়ণ-১৩৩২) নজরুলের চিঠি, শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত নজরুলের পত্রাবলী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৫, পৃ-১০

[১১]আবদুল কাদির সম্পাদিত নজরুল রচনাবলী ৪র্থ খন্ড; নতুন সংস্করণ ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ: ৯৩-৯৮

নজরুলের জীবনবোধে, চিন্তাধারায় ধর্মীয় বাড়াবাড়ি ছিল না। তাঁর ধর্ম ছিল মনুষ্যত্ব, কবিত্ব এবং সংগীতজ্ঞের। সে কারণে তিনি সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক কূপমন্ডুকতা, গোত্রীয় সংকীর্ণতা, বর্ণ বা জাত পাতের হীনতা থেকে মানুষকে মুক্ত করে আধুনিকমনস্ক এক জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। নজরুল ইসলাম সব সময় বিশ্বাস করতেন যে বাঁধ দেয়া ডোবার জলের মতো যদি সাহিত্যিকের জীবন ভগ্ন, বিদীর্ণ, পঙ্কিল, সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহলে সাহিত্য সাধনা ব্যর্থ হবে, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সাধনার ঘরেই সে মারা যাবে। তাই যার প্রাণ যত উদার, মানবিক এবং উন্মুক্ত তিনি তত বড় সাহিত্যিক- যে উদার জীবনবোধেই কাজী নজরুল ইসলাম বেড়ে উঠেছেন ছোট বেলা থেকে। নজরুলের সৃষ্টিকে অনুধাবন করলে দেখা যায় ত্রিশের দশকের শুরু থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর সনাতন ধর্মীয় অংসখ্য গানগুলোর জন্ম। এই বিবর্তন এবং বিচিত্রতাই নজরুলকে শতদলের কবিরূপে পত্র, পল্লবে সুশোভিত করেছিল।

৩য় অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের শ্রেণিবিভাগ

বাংলা ও বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতির দুহিতা না হলেও পালিত কন্যা। কাজেই এতে সনাতন ভাবধারা, জীবনবোধ, দর্শন এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে তা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অর্ধেক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। আর বাকী অর্ধেক সৌন্দর্য ইসলামের স্তম্ভের সাথে জড়িয়ে আছে। ইংরেজি সাহিত্য থেকে যেমন গ্রিক পুরাণের ভাব বাদ দেয়া প্রায় অসম্ভব তেমনি বাংলা সাহিত্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের যেমন রাগ করা অন্যায়, তেমনি হিন্দুরও মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কুঁচকানো অন্যায়। এই যুগপদ মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাইতো কাজী নজরুল ইসলাম হিন্দু দেব-দেবীর নাম, সনাতন ঐতিহ্য, মিথ, আচার প্রথা ইত্যাদিকে তাঁর সাহিত্যে স্থান দিলেন, রচনা করলেন সনাতন ধর্মীয় অসংখ্য গান।

নজরুলের সৃষ্টিকে অনুধাবন করলে দেখা যায় ত্রিশের দশকের শুরু থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর সনাতন ধর্মীয় গানগুলো বিশেষত ভক্তিগীতি ও প্রার্থনা সংগীতগুলোর জন্ম। মুজাফ্ফর আহমদ জানান বিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ও পল্লীসংগীত গায়ক আব্বাস উদ্দীনের অনুরোধে তিনি যথাক্রমে শ্যামা ও কীর্তনাঙ্গের গান রচনা করেছেন।

৩.১ শ্রেণিবিভাগ

বিস্ময়কর এবং অতুলনীয় সংগীতস্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলামের গানের ভাণ্ডার নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ নজরুল সংগীতের সংকলন গ্রন্থ- নজরুল সংগীত সমগ্র; যা নজরুল ইন্সটিটিউট কর্তৃক ২০০৬ সালে রশিদুন্ নবী-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে ৩১৬৩ সংখ্যক গান ছিল। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশের সময় ২০১১ সালে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় নজরুল সংগীত সংগ্রহ। এতে ৩১৭৪টি গান স্থান পায়। তবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, এই গ্রন্থে সম্পাদক গানগুলোর কোন শ্রেণিবিভাজন করেননি। এ প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে–

> "এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত গানগুলির সূচি বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবেই গানগুলির কোনো পর্যায় ভাগ করা হয়নি। ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এ ধরণের কাজে অভিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞদের সহায়তায় জটিল এই কাজটি সম্পাদন করার চেষ্টা করব।"[১২]

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে আব্দুল আজীজ আল আমান সম্পাদিত 'নজরুল গীতি অখণ্ড' সংকলনে নজরুলের গীতসমূহকে ৯টি ভাগে বিভক্ত করেছেন যেমন: কাব্যগীতি, রাগপ্রধান, ইসলামি, ভক্তিগীতি, গজল, লোকগীতি, দেশাত্মবোধক, হাসির গান, হিন্দি গান। প্রায় নজরুল

[১২]নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, সম্পাদনা: রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০১১, সম্পাদকীয়, পৃ-১২।

সংগীত সংকলনেই নজরুল সংগীতকে শ্রেণিকৃত করার ব্যাপারে মিশ্র অভিব্যক্তি কাজ করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সংগীত গবেষক করুণাময় গোস্বামী বলেন–

> "নানা গীতসংকলনে নজরুল সংগীতসমূহকে যথাযথভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় নি। না বিষয়বস্তুগতভাবে, না সাংগীতিকভাবে। কোন কোন সংকলনে বিষয়বস্তুগত শ্রেণীকরণেও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়েছে। বর্তমানে অত্যন্ত জরুরি হচ্ছে নজরুল সংগীতের শ্রেণীকরণের কাজটি সুসম্পন্ন করা। একদিকে বিষয়বস্তুগত শৃঙ্খলা বিধান করা যেমন দরকার, অন্যদিকে সাংগীতিক শ্রেণীবিন্যাসগত শৃঙ্খলা বিধান করাও খুব প্রয়োজন।"[১৩]

তবে পরবর্তীকালে সুসংগত বিষয়বস্তু এবং সাংগীতিক প্রণিধান এ দু'য়ের সমন্বয়ে বিভিন্ন গীতসংকলনে নজরুল সংগীতসমূহকে যথাযথভাবে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে যেখানে নজরুল সংগীতের বিষয়-ভিত্তিক এবং সুর-ভিত্তিক বা সাংগীতিক শ্রেণিবিভাগ পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

করুণাময় গোস্বামী রচিত 'নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় সংগীত রচনাকে বিষয়বস্তুর বিবেচনায় কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যেমন–

- ঈশ্বর বন্দনামূলক গান
- শ্যামাসংগীত
- দুর্গা বিষয়ক গান
- আগমনী
- শিবসংগীত
- শ্যাম সংগীত
- ভজন
- অন্যান্য

(তথ্য উৎস: করুণাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, পৃ-২৫২)

সনাতন ধর্মীয় গানের শ্রেণিবিন্যস্তকরণে রশিদুন্ নবী রচিত 'নজরুল সংগীতের নানা অনুষঙ্গ' গ্রন্থটিতে একটি তালিকাকরণ করা হয়েছে যেখানে বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাসকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে-

- নিরাকার ভজন
- শ্রীকৃষ্ণ সংগীত
- শ্যামা সংগীত
- দুর্গাসংগীত ও আগমনী
- শিবসংগীত
- বিবিধ

(তথ্য উৎস: রশিদুন্ নবী, নজরুল সংগীতের নানা অনুষঙ্গ, পৃ-১৮)

[১৩]করুণাময় গোস্বামী, নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ-৫২৮।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানকে গবেষণার সুবিধার্থে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যস্ত করা হয়েছে-

৩.১.১ শ্যামাসংগীত

৩.১.২ দুর্গাসংগীত ও আগমনী-বিজয়া গান

৩.১.৩ শিবসংগীত

৩.১.৪ কৃষ্ণসংগীত

৩.১.৪.১ কীর্তন

৩.১.৪.২ ভজন

৩.১.৫ অন্যান্য ভক্তিমূলক গান

৩.১.১ শ্যামাসংগীত

কাজী নজরুল ইসলামের আধ্যাত্ম ধারার গানগুলির প্রায় সবই যেমন মর্মস্পর্শী, তেমনি রসোত্তীর্ণ। তাঁর রচিত শ্যামাসংগীতগুলো এই ধারারই অনন্যকীর্তি। শ্যামাসংগীত বাংলা গানের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শক্তিদেবী শ্যামা বা কালী ও উমা বিষয়ক গানকে শ্যামাসংগীত হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সেন এবং কমলাকান্তের ভূমিকা ছিল কিংবদন্তিস্বরূপ। বলা হয়ে থাকে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্তের পর কাজী নজরুল ইসলামের মতো এত মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী শ্যামাসংগীত আর কেউ রচনা করতে পারেননি। তবে শ্যামাসংগীত প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর রামপ্রসাদ সেনের গানের কথা না বললেই নয়। তাঁর প্রচেষ্টা ছিল শক্তি সাধনাকে নীরস শাস্ত্রাচার ও তান্ত্রিকতা মুক্ত করে একটি সহজ, আবেদন পূর্ণ সাংগীতিক অভিব্যক্তি দান করা। তাঁর রচিত 'মন রে কৃষিকাজ জাননা' 'কালী নামে দেওরে বেড়া' 'কালী কালী বল রসনা' 'হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা' ইত্যাদি গান এক সময় শ্যামার আরাধনা সংগীত হিসেবে গীত হত। এছাড়া কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'শ্যামা মা কি আমার কালো' 'আর কিছু নাই শ্যামা তোমার' 'সদানন্দময়ী কালী' 'শ্যামাধন কি সবাই পায়' ইত্যাদি গানগুলো জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে নজরুল শ্যামাসংগীত রচনার পর রামপ্রসাদী শ্যামাসংগীতের পাশাপাশি তাঁর গানও সমাদৃত হয়। শুধু তাই নয়, পরবর্তী সময়ে দাশরথি রায়, রসিক রায়, কালী মির্জা, রঘুনাথ রায় প্রমুখ সংগীত রচয়িতাদের অবদানে শ্যামাসঙ্গীতের ধারা পরিপুষ্টতা লাভ করে। কাজী নজরুল ইসলাম এ ধারায় রাগরাগিনীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এনেছেন বৈচিত্রময়তা। এ প্রসঙ্গে ড. বাঁধন সেনগুপ্ত বলেন-

"রামপ্রসাদ পরবর্তীকালে যারা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের রচনায় উমার প্রভাবই অধিক কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রধানত নজরুলের রচনাতেই শ্যামাসঙ্গীতের সার্থক রূপায়ন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন কারণে নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতকে বাংলা গানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা চলে। প্রথমত ইতিপূর্বে কোন মুসলিম কবির রচনায় এমন সার্থক শ্যামাসঙ্গীত অন্তর্ভূক্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত কবির সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই এত সঠিক সংখ্যক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।"[১৪]

---

[১৪]আব্দুল আজিজ আল-আমান সম্পাদিত, নজরুল গীতি, অখন্ড, হরফ প্রকাশনী, এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭, প্রথম প্রকাশ-১৯৭৮, পৃ: ৩৫

ড. করুণাময় গোস্বামী রচিত 'বাংলা গানের বিবর্তন' বইয়ের মাধ্যমে জানা যায়- শ্যামাসংগীতের অপর নাম শাক্তসংগীত। তাই বলা যায়, কাজী নজরুল ইসলাম শক্তিস্বরূপিণী দেবীবন্দনামূলক শাক্তসংগীত রচনার মধ্যদিয়ে দেবীকে গণমানুষের কাছে আরাধ্য করে তুলেছেন। শ্যামাসংগীতে নজরুলের অবদান সম্পর্কে ড. করুণাময় গোস্বামী বলেছেন-

> "শ্যামাসংগীত রচয়িতারূপে রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সাংগীতিক নান্দনিকতার যে স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, নজরুল তদপেক্ষা উচ্চস্তরে পৌঁছেছিলেন; কেননা, কবি ও সুরস্রষ্টারূপে তিনি পূর্ববর্তী সংগীত রচয়িতাদের চেয়ে মহৎ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সে পরিচয় তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে রেখেছেন তার গানে।"[১৫]

নজরুলের লেখনীতে এবং সুরের সাবলীলতায় শ্যামাসংগীতের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে। বিষয়বৈচিত্র ও রাগের সমন্বয় করে নজরুল এ সংগীতকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছেন। শক্তিদেবী কালীর মহিমা প্রচারে একদিকে যেমন মহাকালীকে রণরঙ্গিনী, ভয়ঙ্করী মূর্তিতে আবাহন করেছেন, অন্যদিকে তাকেই স্নেহময়ী জগৎ জননী, প্রেমময়ী মূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণী 'কালী কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ই কালী'- একে উপজীব্য করে নজরুল কালী আর রাসবিহারী শ্যামে কোনো তফাৎ দেখেননি।
নজরুলের শ্যামাসংগীত শৈল্পিক পর্যায়ে এক অনন্য উচ্চতার দাবি রাখে। তাঁর গানের মধ্যে শ্যামার বহুবর্ণিল, মনোহর রূপের বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। শ্যামাকে তিনি নিজের মতো করে, নিজস্ব দর্শন দিয়ে বিনির্মাণ করেছেন। প্রার্থনার জন্য তন্ত্রমন্ত্রের প্রয়োগ না করে সৃজন করেছেন নিজস্ব ভাষা। নজরুলের এই ভক্তি ও প্রেম রস মিশ্রিত শ্যামাসংগীত বিশ্লেষণ করে দেখলে বোঝা যায় নজরুলের জ্ঞানের গভীরতা কতটা দৃঢ় ছিল শ্যামা সম্পর্কে।

'কালী' শব্দটি 'কাল' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ যার অর্থ 'ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ।' 'কাল শব্দের দুটি অর্থ রয়েছে– 'নির্ধারিত সময়' এবং প্রসঙ্গক্রমে তা 'মৃত্যু' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক টমাস কর্বানের মতে, কালী শব্দটি নাম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে আবার 'কৃষ্ণবর্ণা' বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে। প্রকৃত অর্থে কাল বা সময় কে যিনি রচনা করেন তিনি কালী। আবার শ্রী শ্রী চণ্ডীতে পাওয়া যায়–

> "ইয়া দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যাবিধীয়তে-
> নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমো ঃ হ।"

-এ কারণে অনেকেই কালীকে ক্রোধান্বিতা, রণরঙ্গিণী বা করালবদনা বলেও অভিহিত করে থাকেন। পরবর্তীকালে ধর্মীয় সমন্বয়বাদের প্রধান প্রবক্তা ও চালিকা শক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আদ্যাশক্তি মহামায়া সম্পর্কে বলেন–

> "তিনি মহামায়া, জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন আবার সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জিনিসই কেবল দেখা যায়– সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। এই আদ্যাশক্তির মাঝেই বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে।"[১৬]

–কালী, শ্যামা বা আদ্যাশক্তি সম্পর্কে এই নিগূঢ় জ্ঞান কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অন্তর্চক্ষু এবং গভীর প্রজ্ঞাবোধ দ্বারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এই প্রজ্ঞাবোধের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর রচিত শ্যামাসংগীত গুলোর

---

[১৫]নজরুলগীতি প্রসঙ্গ: ড. করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী ১৯৯৬, পৃ-২৫৩।
[১৬]শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, শ্রী 'ম' কথিত, কম্পু কলার, ৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রকাশকাল ১৯৮৩।

মাঝে। এমন ভক্তিমিশ্রিত ভালোবাসার প্রকাশ যেন ভক্ত নজরুলের পক্ষেই সম্ভব। নজরুলের শ্যামাসংগীত বিশ্লেষণ করলে শ্যামাভক্তির তিনটি রূপ পরিলক্ষিত হয়-

- কন্যারূপী শ্যামা
- মাতৃরূপী শ্যামা
- অশুভনাশিনী শ্যামা

(তথ্য উৎস: সাকার মুস্তাফা, নজরুলের শ্যামাসাধনা ও শ্যামাসংগীত, পৃ-৩৭)

নজরুলের শ্যামাসংগীতের মধ্যে কন্যারূপী শ্যামার রূপটি খুবই মনোমুগ্ধকর, যেখানে শ্যামা এক গ্রামীণ বালিকা। শ্মশানময়ীর সেই ভয়ংকর রূপ তার নেই, বিনিময়ে আছে এক মায়াবী, আদরিণী, প্রাণোচ্ছল বালিকার আনাগোনা। যেমন-

"আদরিনী মোর কালো মেয়ে রে কেমনে কোথায় রাখি
তারে রাখিলে চোখে বাজে ব্যথা বুকে বুকে রাখিলে
দুখে ঝুরে আঁখি॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩০৮)

উক্ত গানে কাজী নজরুল ইসলাম যেন আদরিণী এবং বহু প্রতীক্ষিত এক কিশোরী বালিকার কল্পরূপ অঙ্কন করেছেন। প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা এ কিশোরীকে যেন কাঙ্গালের ধনের মত আগলে রাখতে চান তিনি, বেঁধে রাখতে চান হৃদমাঝারে। এজন্য আকুল হয়ে 'মা' বলে সম্বোধন করেন। আরও অসংখ্য গানে এমন চিত্র ফুটে উঠেছে–

"আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে (মা'কে) কে দিয়েছে গালি
রাগ ক'রে সে সারাগায়ে মেখেছে তাই কালি॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩১১)

"কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন
(তার) রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব যার হাতে মরণ বাঁচন॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩৪৮)

"পাষানী মেয়ে! আয়, আয় বুকে আয়
জগত জননী হয়ে কি মাগো জননীরে কাঁদায়॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৪১৫)

এসব গানে শ্যামা কোনো দেবী থাকেন না বরং তিনি হয়ে ওঠেন গ্রামীণ জীবনের বালিকা, ঘরের মায়াবী, আদুরে মেয়ে। তিনি রাগ, দুঃখ, অভিমান করেন, আবার লাজে রক্তিমবর্ণ ধারণ করেন। আবার যখন মনের কোণে এক টুকরো খুশির সঞ্চার ঘটে তখন আপন ছন্দে নৃত্য করেন, তার পায়ের নিচে মহাকাল শিব বুক পেতে দেয়। একইভাবে যখন পাষাণী হয়ে ওঠেন, সেই পাষাণীর পাষাণ হৃদয় গলাতে, একটু মমতা পেতে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন ভক্ত নজরুল, একাগ্রচিত্তে গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে সমর্পিত করেন মায়ের চরণে।

শ্যামার মাতৃরূপের মধ্যে দু'টি রূপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একরূপের মধ্যে নজরুল নিজেই প্রার্থনারত হয়েছেন নিজের মুক্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য- যেখানে মান, অভিমান, ভালোবাসা, বিরহ, যুক্তিতর্ক সব আছে যেমনটি থাকে মায়ের প্রতি সন্তানের। তাই শ্যামা মা'কে পেতে দেন হৃদয়ের আসন। অন্যদিকে শ্যামার মাতৃরূপের আরেকটি দিক বিশ্বজনীন, যেখানে তিনি কারো একার মা নন, তিনি জগৎজননী। বস্তুত মা সদা সর্বদাই বিশ্বজনীন, বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা সর্বত্র-এই ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে নজরুলের এ সমস্ত গানে। যেমন-

"আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ আজও মুক্তি নহি
আজও অন্যে আঘাত দিলে কঠোর ভাষা কহি॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩০৭)

উপরোক্ত গানে নজরুল যেন জগৎজননী মায়ের কাছে সকল অনুভূতি আর অনুভবের ডালি নিয়ে আসন পেতে বসেছেন। আত্ম সুখ, ঐশ্বর্য নিয়ে যখন সকলে মত্ত, নজরুল তখন বিশ্বজননীর কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য, ষড়রিপু বিসর্জন দিয়ে মানবের মুক্তির প্রার্থনা করেছেন। এমন আরও গান রয়েছে–

"আমার হৃদয় হবে রাঙা জবা দেহ বিল্বদল
মুক্তি পাবো ছুঁয়ে মুক্তকেশীর চরণতল॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩১৬)

"কে বলে মোর মাকে কালো, মা যে আমার জ্যোতির্মতী
কোটি চন্দ্র সূর্য তারা নিত্য করে যার আরতি"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩৫৩)

"মাগো তোরি পায়ের নূপুর বাজে এই বিশ্বের সকল ধ্বনির মাঝে
জীবের ভাষায় পাখির মধুর গানে, সাগর রোলে নদীর কলতানে
সমীরণের মরমরে শুনি সকাল সাঁঝে॥"

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৪৪৯)

এই রূপের মধ্য দিয়েই সকল শুভ, সুন্দর, কল্যাণের যেমন প্রকাশ ঘটেছে তেমনি মা ছেলের সম্পর্কের মান-অভিমান, আদর, ভালোবাসাময় বহু দিক উন্মোচিত হয়েছে।

শ্যামা মায়ের আরেকটি রূপ অশুভনাশিনী, অকল্যাণের বিরুদ্ধে। কবি শ্যামার অশুভনাশিনী, অসুর বিনাশিনী রূপের উদ্বোধন কামনা করেছেন এভাবে-

"জ্বালো দেয়ালী জ্বালো

অসীম তিমিরে শ্যামা মা যে অযুত কোটি আলো॥”

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩৭৬)

–এ গানে নজরুল যেন অসীম আঁধার মাঝে আলোকবর্তিকা হাতে শ্যামা মায়ের এক চমৎকার চিত্রকল্প এঁকেছেন। সকল জরা, ব্যাধি, তমসা, অশুভকে বিনাশ করতে এবং সকলের জীবনকে দীপাবলীর শুভ্র আলোকে আলোকিত করতে শুভশক্তির প্রকাশ হিসেবে কবি এখানে শ্যামা মায়ের এক স্নিগ্ধ, লাবণ্যময়ী রূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এরকম আরো একটি গান–

“জয় মহাকালী, জয় মধু কৈটভ বিনাশিনী
জয় যোগনিদ্রা জয় মহামায়া ধর্ম প্রদায়িণী॥”

(আবদুল ও ব্রহ্মমোহন সম্পাদিত, ২০০৪: ৩৭২)

তাঁর রচিত ১০০টি শ্যামাসংগীত নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ ‘রাঙা-জবা’। অন্তরে ভক্তি ও আধ্যাত্মবাদের জাগরণ না ঘটলে সুরও বাণীর এমন চমৎকার বিশ্লেষণ ঘটানো সম্ভব নয়।

৩.১.২ দুর্গাসংগীত ও আগমনী-বিজয়া গান

শিব-পার্বতী, উমা বা দুর্গা-র কাহিনী অবলম্বনে রচিত এক প্রকার জনপ্রিয় গীতরূপ হল দুর্গাসংগীত ও আগমনী গান। এর সঙ্গে শারদীয় দুর্গোৎসবের একটা সম্পর্ক রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে ধনাঢ্য পিতা গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীর বিবাহ হয় দরিদ্র শিবঠাকুরের সঙ্গে। বিবাহ পরবর্তীতে কন্যা স্বামীর ঘরে চলে গেলে সেখানে মেয়ের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের কথা চিন্তা করে মা মেনকার মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শারদীয় কোনো এক রাতে মা মেয়ে উভয়ে উভয়কে স্বপ্নে দেখেন। মেনকা স্বামীকে অনুরোধ করেন উমাকে নিজগৃহে নিয়ে আসার জন্য। পিতা-মাতার অনুরোধে উমা মাত্র তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমন করেন। তাঁর এ আগমনকে কেন্দ্র করে রচিত গানই আগমনী গান। আবার উমা যখন পুনরায় পতিগৃহে ফিরে যান, তখন যে বিষাদের সুর বেজে ওঠে তাকে কেন্দ্র করে রচিত গানগুলিই বিজয়া গান নামে পরিচিত। এ দু’ প্রকার গানকে একত্রে বলা হয় আগমনী-বিজয়া গান। উমার পিত্রালয়ে আগমনকে কেন্দ্র করে উৎসবের কথা বাংলার মঙ্গলকাব্যের ধারায় প্রথম উদ্ভাস দেখা যায় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের লেখায়। অন্নদামঙ্গলে সেই পংক্তিগুলোতেই আমরা পাই আগমনী গান এর প্রথম আভাস-

“বড় আনন্দ উদয়
বহুদিনে ভগবতী আইল আলয়
শঙ্খ-ঘণ্টারব, মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়”

পরবর্তী সময়ে এই থিমের উপর অনেক শক্তিমান পদকর্তাই গান লিখেছেন। ধীরে ধীরে কবি গানের আসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ভবানী বিষয়ক গানে উঠে আসতে শুরু করলো মেনকার দুঃখ-বেদনার

কথা। রামনিধি গুপ্ত (নিধি বাবু) থেকে দাশরথি রায় সকলের কলমের ছোঁয়াতেই জীবন্ত হয়ে উঠেছে উমার ঘরে ফেরার গান-আগমনী। পরবর্তীকালে এ গানগুলোর বিষয়বস্তু এবং বাৎসল্য রস যেন বাঙালির গার্হস্থ্য জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেল। বাঙালি মায়েরাও স্বামীগৃহে মেয়ের সুখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হত, তারাও আকুলভাবে মেয়েকে কাছে পেতে চাইত আর মেয়েরাও পিতৃগৃহে আসার জন্য সারাবছর অপেক্ষায় থাকত এবং সে সুযোগটি ঘটত সাধারণত শারদীয় দুর্গোৎসবের সময়। সামাজিক প্রেক্ষাপটে আগমনী গান বাঙালি জীবনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। আর এ আলোড়নকে পরবর্তীকালে বহুগুণে বিস্তৃত করেছিল কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর উপলব্ধি ও প্রজ্ঞাবোধ দিয়ে। মহিষাসুর মর্দিনী দুর্গাকেও তিনি আগমনী গানের মধ্য দিয়ে পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালির দ্বারপ্রান্তে।

হিন্দু শাস্ত্রে দুর্গা নামটির ব্যাখ্যা নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে-

"দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত ॥
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরকীর্তিত॥"

-'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, 'উ-কার' বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ' অক্ষর পাপনাশক ও 'আ-কার' ভয়-শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, 'দূর্গং নাশয়তি- যা-নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা'-অর্থাৎ দুর্গা নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিত। আবার শ্রীশ্রী চন্ডী অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষদেবগনশক্তিসমূহমূর্ত্যাঃ' অর্থাৎ সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

হিন্দুধর্মের এসব শাস্ত্রীয়জ্ঞানে পারঙ্গম ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আর তাইতো তিনি মহাশক্তিরূপা দেবীকে মহাকালরূপে অনন্ত শক্তির আধার বলে জেনেছেন। প্রতিটি জীবসত্তার মাঝে নানা রূপে দেবী অধিষ্ঠিত। নানা রকম মোহ, মায়া, রিপু, আসুরিক শক্তি এই জীবসত্তাকে বিভ্রান্ত করে অশুভ, অকল্যাণের পথে নিয়ে যায়। এ থেকে মুক্তির উপায়স্বরূপ দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তিকে জাগ্রত করতে নজরুল ইসলাম রচনা করলেন আগমনী গান, আবার দেবী দুর্গার আনন্দ আগমন উপলক্ষেও নজরুল আগমনী গানের ধারাকে বিস্তৃত করেছেন-

"মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।
মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রী দূর্গা
তাই দূর্গতি কাটিল না হায়॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ২৬৯ পৃ.)

"জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী চিন্ময়ী রূপে জাগো,

তব কনিষ্ঠা কন্যা ধরণী কাঁদে আর ডাকে মা গো॥”

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১৫১ পৃ.)

“মহাকালের কোলে এসে গৌরী হল মহাকালী
শ্মশান চিতার ভস্ম মেখে ম্লান হল মার রূপের ডালি॥”

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১৯৪ পৃ.)

“মা এসেছে, মা এসেছে উঠল কলরোল,
দিকে দিকে বেজে ওঠে সানাই কাঁসর ঢোল॥”

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ২৫৬ পৃ.)

“ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী
দুখ-পাপ-তাপ-হারিণী ভবানী॥”

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ২৯০ পৃ.)

“কে সাজালো মাকে আমার বিসর্জনের বিদায় সাজে
আজ সারাদিন কেন এমন করুণ সুরে বাঁশি বাজে॥”

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ২২৮ পৃ.)

“বরষা গেল, আশ্বিন এলো, উমা এলো কই
শূণ্য ঘরে কেমন করে পরাণ বেঁধে রই॥”

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৬০৭ পৃ.)

দেবী দুর্গা শাশ্বত। তাঁর আবাহন হয়, বিসর্জন হয় না। পরম ব্রহ্মময়ী ও শক্তিদায়িনী দেবী দুর্গা, দুর্গে বন্দী না থেকে অন্তরে- বাহিরে সর্বত্র প্রকাশিত হয়ে উঠেছেন দশভূজারূপে। আর এ শাশ্বত সত্যই বিধৃত হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কাজী নজরুল ইসলামের দুর্গাসংগীত ও আগমনী -বিজয়া গানে।

৩.১.৩ শিবসংগীত

যিনি শাশ্বত, জন্মরহিত, সর্বকারণের কারণ; যিনি স্ব-স্বরূপে বর্তমান, সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি, আদি ও অন্তবিহীন তিনিই শিব। শিব-সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়-এই তিনের কারণেই তিনি পরমেশ্বর। তিনিই লীলাচ্ছলে ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন আবার রুদ্ররূপ ধারণ করে সংহার করেন। এই তিন রূপের মধ্যে সত্ত্বাগত কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সকলের মূল স্বরূপ- যা সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ তাই শিব।

কাজী নজরুল ইসলাম যেহেতু ছোটবেলা থেকেই নানারকম ধর্মীয় গ্রন্থ পঠন-পাঠনে নিমগ্ন থাকতেন, সেগুলো থেকে রসাস্বাদন করে সহজ, সরল উপস্থাপনা দিয়ে তাঁর রচনাগুলোকে সাবলীল করে তুলতেন। ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করে তিনি ভগবান শিবের আদি ও বিমূর্ত রূপের

যে চিত্রকল্প পেয়েছেন, সেটি তাঁর লেখনীতে যেন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলা কাব্য সংগীতের ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বে রামপ্রসাদ সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ উৎকৃষ্ট শিবসংগীত রচনা করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলাম প্রায় ৩০ এর অধিক উৎকৃষ্ট শিবসংগীত রচনা করেছেন। শিবের ১০৮টি নামের অনেকগুলো উঠে এসেছে নজরুল রচিত শিবসংগীত গুলোতে যেমন- নটরাজ, স্বয়ম্ভু, অরুণ ভৈরব, মহাদেব, রুদ্রশঙ্কর ইত্যাদি। নজরুলের একটি বিখ্যাত শিবসংগীত 'গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু' গানটি প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন:

> "কাজীর ছিল এই শ্রেণীর মন-স্বভাবপ্রবুদ্ধ কবিপ্রাণ, সহজ বিশ্বাসী অন্তর ও সর্বোপরি অসামান্য প্রতিভা যার আবাহনে দিগন্তে অসীমের শুভ্রলোকের সঙ্গে মর্ত্যের অসীম আঁধারের মিলনবাণী তার মনে জন্ম নিত অনন্যতন্ত্র ছন্দ ভাষার কল্পলোক। এ কথার একটি পরম পরিচয় আমি সে যুগেই পেয়েছিলাম যখন সে ধর্মের দিকে পা বাড়ালেও সীমান্ত পেরোয়নি। লিখেছিল একটি অপরূপ সপ্তমাত্রিক শিবস্তোত্র, বানিয়েছিল মালকোষ। এ গানটি আমার ও অতুল প্রসাদের একটি বিশেষ প্রিয় গান ছিল আমি গাইতাম প্রায়ই তারঁ কাছে। শিবের এমন উদাত্ত ঝঙ্কার স্তোত্র এ যুগে সত্যি বিরল। মিল, ছন্দ, উপমা সব জড়িয়ে কী অপূর্ব ছবিই না ফুটে উঠল এ জমকালো গানটিতে। পাখোয়াজে গাইতে গাইতে শুধু আমিই যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতাম তাই নয়, শ্রোতাদের মন ও সম্ভ্রমে ভরে উঠত, যার ইংরেজি নাম 'awe' এমন শক্তিস্পন্দিত গান বাংলা ভাষায় বিরল।"[১৭]

শিব বিষয়ক গানকে ধ্রুপদ বা খেয়াল অঙ্গে রচিত কাব্যসংগীতের পর্যায়ে প্রতিভাত করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম অপরিসীম ভূমিকা পালন করেন। আরেকটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে রাগসংগীত নিয়ে যখন নজরুল গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হলেন এবং নবরাগ সৃষ্টি করলেন তখন শিব বিষয়ক গানে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখালেন। সতেরটি নজরুল সৃষ্ট রাগের মধ্যে বেশ কয়েকটি রাগনামে শিব বা শিববাচক কথাটি পাওয়া যায়। যেমন-শিব সরস্বতী, উদাসী ভৈরব, অরুণ ভৈরব, রুদ্র ভৈরব ইত্যাদি এবং নবরাগে বেশ কয়েকটি শিবসংগীত পাওয়া যায়। নবরাগে রচিত শিবাণী ভৈরবী-র গানে কাজী নজরুল ইসলাম পৌরাণিক দেবতা শিবকে এক অনন্য মহিমায় উপস্থাপন করেছেন এবং শিবনাম জপে অশ্রুমতি নিষ্প্রাণ, জ্যোতিহীন এ ধরায় প্রাণসঞ্চারের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি মতে, সতীর পিতা দক্ষ এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু জামাতা শিবের নানা কর্মকাণ্ডে বিরাগভাজন এবং বিদ্বেষপরায়ণ বসত শিব এবং কন্যা সতীকে উক্ত যজ্ঞে আমন্ত্রণ জানাননি। সতী এ বিষয়ে অবগত হয়ে অযাচিতভাবে যজ্ঞে যাবার অনুমতি প্রার্থনায় শিবের কাছে যান। এ সময় শিব ধ্যানস্থ থাকায় তাঁর ধ্যান ভাঙানোর জন্য সতী যোগিনীদের সাথে নিয়ে শিবের সম্মুখে উপস্থিত হন। ধ্যানভঙ্গের পর সমস্ত বিষয়ে অবগত হলে শিব সতীকে অনাহূতভাবে দক্ষযজ্ঞে যেতে বারণ করেন। কিন্তু পিতৃভক্ত সতী সে নিষেধ অমান্য করে দক্ষ যজ্ঞে উপস্থিত হন। দক্ষযজ্ঞে সতীর সমুখে প্রাণপ্রিয় স্বামী শিবের নিন্দা করলে সতী শোকে, তাপে হতবিহবল হয়ে যান এবং দেহত্যাগ করেন। শিবানী ভৈরবী ধ্যানমগ্ন শিবকে এ সংবাদটি গানের মাধ্যমে শোনান এবং শিবকে বলেন যে ভগবান শিব, জেগে ওঠো– সতী এ ধরাধাম ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর অবর্তমানে এ দেবভূমি অসার, অচল, নিষ্প্রাণ, বন্ধ্যা হয়ে গেছে; চন্দ্র-সূর্য জ্যোতিহীন,

[১৭]নজরুল গীতি প্রসঙ্গ, করুণাময় গোস্বামী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ: ২৫৮,২৫৯।

ম্লান হয়ে গেছে। সন্তানের মৃত্যুতে পিতা, মাতা যেমন শোকস্তব্ধ হয়ে যায় তেমনি কন্যাসম সতীর মৃত্যুতে এ ভূভারত, ধরিত্রীমাতা যেন শ্মশানে পরিণত হয়েছে এবং অশ্রুমতী হয়ে অবিরাম শিবনাম জপ করছে।

শিবানী ভৈরবী চরিত্রটি জগৎঘটক রচিত উদাসী ভৈরব নাটিকার জন্য সৃষ্ট। এই চরিত্রের নামানুসারে নজরুল নবসৃষ্ট রাগের নাম রেখেছেন শিবানী ভৈরবী এবং এ রাগেই গানটির সুর করেছেন যা উদাসী ভৈরব নাটিকার সূচনা সংগীত। গানটির বাণী ও সুরে কাজী নজরুল ইসলাম এক অভূতপূর্ব দৃশ্যপটের অবতারণা করেছেন-

"ভগবান শিব জাগো জাগো,
ছাড়িয়া গেছেন দেবী শিবাণী সতী।
শক্তিহীন আজি সৃষ্টি চন্দ্র-সূর্য-তারাহীন জ্যোতি॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৪৯০ পৃ.)

নজরুলের আরো কয়েকটি শিবসংগীত-

"সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ
হে মহাকাল প্রলয়-তাল-ভোলো ভোলো॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৯৪ পৃ.)

"এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর
রুদ্রভৈরব! সৃষ্টি সংহর সংহর॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৩৬৪ পৃ.)

"হে শিব সুন্দর শরত-চাঁদ-চুড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি,
ভরিল নভোতল ক্রন্দনে॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৬০ পৃ.)

"গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৫৯ পৃ.)

"জাগো অরুণ ভৈরব জাগো হে শিব ধ্যানী
শোনাও তিমির-ভীত-বিশ্বে নব দিনের বাণী॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৪২৩ পৃ.)

ভক্ত আর ভগবানের এক অপূর্ব গাঁথায় রচিত এ গানগুলো।

৩.১.৪ কৃষ্ণসংগীত

পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করে যেসব সংগীত রচিত হয়েছে সেগুলো কৃষ্ণসংগীত নামে অভিহিত। কৃষ্ণসংগীতের দুইটি ধারা পরিলক্ষিত হয়-

৩.১.৪.১ কীর্তন
৩.১.৪.২ ভজন

৩.১.৪.১ কীর্তন

কীর্তনের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'গুণবর্ণনা' বা যশঃপ্রচার। বাংলা সংগীতের অন্যতম আদি ধারা কীর্তন। গানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের নাম, গুণ-কীর্তনের একটি পন্থা হিসেবে কীর্তনের উদ্ভব। গানের মধ্য দিয়ে ধর্মচর্চার এ ধারা প্রাচীনকাল থেকেই এদেশে বহমান এবং সে ধারাবাহিকতায় বাংলার বৈষ্ণব ধর্মজাত সংগীত ধারার বিকশিত রূপই কীর্তন। বলা হয়ে থাকে, "নাম, লীলা গুণাদীনাং উচ্চৈভার্ষা-তু কীর্তনম্" অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। অর্থাৎ কীর্তন বলতে ভগবদ বিষয়ক সংগীত বোঝায় এবং বিশেষ ভাবে শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করে যে সংগীত তাকেই কীর্তন নামে অভিহিত করা হয়। কীর্তন দু'প্রকার: ১) নামকীর্তন ২) লীলাকীর্তন বা রসকীর্তন। নামকীর্তনে ঈশ্বরের নামগান ও করুণার কথাই প্রধান আর লীলাকীর্তনে ঈশ্বরের রূপ গুণ ও বিবিধ মনোহারী লীলার বর্ণনাই প্রাধান্য লাভ করে।

জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কীর্তন গানের আদি উৎস। এতে বিভিন্ন রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। এর পদগুলি যে সাংগীতিক কাঠামোতে রচিত, পরবর্তীকালের কীর্তনের ধারায় তারই প্রভাব লক্ষ্যণীয়। বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' থেকেই কীর্তন নামের এ সংগীতধারার বিকাশ ঘটে। কাছাকাছি সময়ে মিথিলার কবি বিদ্যাপতিও ব্রজবুলিতে কীর্তনাঙ্গের বৈষ্ণবপদ রচনা করেন। পনেরো শতকে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে কীর্তন গানে অসামান্য বেগ সঞ্চারিত হয়। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন যে, নারী-পুরুষ ও বয়স নির্বিশেষে সংগীতের আবেদন সর্বাধিক এবং কোনো কঠিন বিষয়ের প্রতি অশিক্ষিত কিংবা স্বল্প শিক্ষিত জনগণকে আকৃষ্ট করার সহজতম উপায় হচ্ছে সংগীত তাই লৌকিক আচার প্রথাকে সরিয়ে ঈশ্বর সাধনার সহজতম পন্থা হিসেবে তিনি বেছে নেন কীর্তনকে। তিনি সকলকে জানান, কোনো শাস্ত্র নয় কেবল 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'- এই ষোল পদবিশিষ্ট কীর্তন করলেই হৃদয়ে সৃষ্ট প্রেমরসের সঞ্চারণ দ্বারাই একমাত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। এতে সাধারণ মানুষ তাকে অনুসরণ করে কীর্তন গাইতে শুরু করে ফলে কীর্তন একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়। এভাবেই চৈতন্যদেব কীর্তনের মাধ্যমে তাঁর আদর্শ, আধ্যাত্মচিন্তা এবং তাঁর সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ধর্ম সারা বাংলায় প্রচার করেন। তিনিই নামকীর্তনের পরিপূর্ণ সাংগীতিক রূপ দান করেন এবং এ গানকে আধ্যাত্মমার্গে উন্নীত করে বাঙালির কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন।

শাস্ত্রে নবধাভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ কীর্তন। কীর্তনের পাঁচটি অঙ্গ: কথা, দোহা, আখর, তুক ও ছুট। এর মধ্যে আখরকে পদের ব্যঞ্জনা ও ব্যাখ্যাগত অংশ বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কীর্তনের আখর হল কথার

তান।' কবিগুরু তাঁর অসংখ্য গানে কীর্তনের সুর প্রয়োগ করেছিলেন। আর ভারতীয় বিভিন্ন সুরসাগরে ভেসে সুর নিয়ে গবেষণাকালে কাজী নজরুল ইসলাম কীর্তনের সুরে বিমোহিত হন এবং কীর্তনের প্রেমরসে যেন ভেসে যান বৃন্দাবন, নবদ্বীপধামে। প্রচলিত কীর্তনের সুরের সঙ্গে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণে সৃষ্টি করেন কীর্তনের নতুন ধারা।

দুটি ভাগে নজরুলের কীর্তন রচনাকে ভাগ করা যায়। একভাগে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেসব গানকে যেগুলোর বিষয়বস্তু নারায়ণ। নারায়ণ শব্দের অর্থ 'যিনি জলের উপর শয়ন করেন।' ভগবত পুরাণ মতে, জল প্রথম সৃষ্ট বস্তু হওয়ায় ভগবান নারায়ণের বাস জলেই। হিন্দু চিত্রকলা বা শিল্পকলায় নারায়ণকে প্রায়শই জলে অবস্থানকারী মূর্তিতে চিত্রিত করা হয়। সংস্কৃত ভাষায় 'নর' শব্দের অর্থ মানুষ। তাই 'নারায়ণ' শব্দের আরেকটি অর্থ হল 'মানুষ যেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে।' ভগবত পুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায় নারায়ণের অপর নাম 'মুকুন্দ' যার অর্থ 'যিনি জন্ম ও মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি বা মোক্ষ প্রদান করেন।' নারায়ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, যিনি শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করেন। অপরভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ভগবান বিষ্ণুর অষ্টম অবতার রূপে খ্যাত কৃষ্ণকে নিয়ে সেসব গান যেখানে কৃষ্ণকে উপস্থাপন করা হয়েছে ব্রজলীলার রসঘনশ্যাম এবং গোপীবল্লভরূপে। কৃষ্ণ শব্দের অর্থ কালো বা ঘন নীল। হিন্দু দর্শন ও ধর্মতাত্ত্বিক ঐতিহ্যে কৃষ্ণ সংক্রান্ত উপাখ্যানগুলি বহুল পরিসরে পরিব্যাপ্ত। রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার পটভূমিতে নজরুল এসব গান রচনা করেছেন। পদাবলি কীর্তনের ঐতিহ্যানুসারে নজরুল অসংখ্য কীর্তন গান রচনা করেছেন। আবার কীর্তনভাঙ্গা সুরও কোথাও কোথাও প্রয়োগ করেছেন। যেমন-

"আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি
বোঝনি কি রসিক বধু॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১০২ পৃ.)

"সখি আমি-ই না হয় মান করেছিনু
তোরা তো সকলে ছিলি,
ফিরে গেল হরি, তোরা পায়ে ধরি, কেন নাহি ফিরাইলি॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৭৯০ পৃ.)

"মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি
তুমি ব্রজের বালারে রাই কিশোরীরে
ভুলাইলে যেই রূপ ধরি॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৬৩২ পৃ.)

"জাগো জাগো শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী
জাগো শ্রীকৃষ্ণ-তিথির তিমির অপসারি॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১৫১ পৃ.)

"হে প্রবল দর্পহারী কৃষ্ণ-মুরারি।
শরণাগত -আর্ত-পরিত্রান-পরায়ন
যুগ যুগ সম্ভব নারায়ণ দানবারি॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৩৩ পৃ.)

"তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম
আমারি মতন-দিবস-নিশি জাপিতে শ্যাম নাম॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ২১ পৃ.)

কৃষ্ণলীলার বিশেষ একটি আকর্ষণীয় উৎসব ঝুলন নিয়ে নজরুল বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। যেমন-

"সোনার হিন্দোলে কিশোর-কিশোরী দোলে
ঝুলনের উৎসব রঙ্গে॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৯২ পৃ.)

"এলো কৃষ্ণ কানাইয়া তমাল বনে সাজো ঝুলনের সাজে
তারে গোপ বালিকার মালা পরাব আজি এ রাখাল রাজে॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১২৯ পৃ.)

"মম বন ভবনে ঝুলনে দোলনা দে দুলায়ে উতল পবনে
মেঘ দোলা দুলে বাদল গগনে॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৮৪ পৃ.)

কীর্তনের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থান নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি ভাব বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে সমাজে সাম্য, মিত্রতা ও ভ্রাতৃত্বের এক নব দিগন্তের উন্মোচন করেছিল কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কীর্তন রচনার মধ্য দিয়ে।

৩.১.৪.২ ভজন

আধ্যাত্মিক হিন্দুয়ানী ঘরানার গানেরই একটি ধারা ভজন। সৃষ্টিকর্তার প্রতি ভালবাসার সুগভীর মহিমা প্রকাশের জন্য সুর করে ভজন গাওয়া হয়। তথ্য মতে, মোঘল যুগে ভক্তি আন্দোলনের অংশ হিসেবে দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলাদেশসহ সমগ্র উপমহাদেশে এর বিস্তৃতি ঘটে। ভজন, মন্ত্র কিংবা কীর্তনের চেয়েও সহজ হতে পারে আবার শাস্ত্রীয় রাগপ্রধান এবং তাল সমৃদ্ধ গান হিসেবে গীত হয়ে থাকে। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যতা, ধর্মের উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা ভজনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ভারতীয় সংগীতের স্বর্ণযুগ হিসেবে খ্যাত ষোড়শ শতকে ভজন ব্যাপক প্রসার লাভ করায় তা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকেনি। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রার্থনাসংগীত হিসেবে বহু ভজন রচিত হয়েছে। ভজনের মূল প্রতিপাদ্য ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং মানুষে মানুষে বিভেদহীনতা প্রচার করা। হিন্দিতে রচিত মীরার

ভজন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। আর কবীর, সুরদাস, দাদু, রজ্জব, নানক, তুলসীদাস প্রমুখ সাধকের গানে মানবতার জয়গান এবং বৈষ্ণব ও সুফি চিন্তাপ্রসূত ভক্তিবাদের ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে। এ সকল গানের উদার মর্মবাণী, উদাত্ত আহবান সমাজের কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ভেদজ্ঞান দূরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। কবীরের একটি ভজনে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরকে মসজিদ মন্দিরে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে মানুষের অন্তরে।

ভজন সাধারণত হিন্দি ভাষায় রচিত হলেও বাংলা এবং ভারতীয় অনেক প্রাদেশিক ভাষায়ও রচিত এবং গীত হয়েছে। বাংলা ভজন গানের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি নাম কাজী নজরুল ইসলাম এবং বাংলা ভজনের যে ধারা তিনি সৃষ্টি করেন তা ব্যাপকভাবে প্রশংসা পায়। নজরুল ছিলেন সুর চুম্বক। যেখানে কানে যা আসত, ভালো লাগত তা তিনি বাংলা গানে প্রয়োগ করেছেন এবং কালজয়ী সব সৃষ্টিতে মেতেছেন। আর তাইতো মীরাবাঈ, কবীর, নানক প্রমুখের ভজন তাঁর মনে যে উদ্বেল, উৎকণ্ঠা জাগিয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বাংলায় ভজন রচনা করলেন তিনি। যেমন-

"চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৭০ পৃ.)

"ওরে নীল যমুনার জল! বল রে মোর বল
কোথায় ঘনশ্যাম-আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম-এলাম ব্রজধাম॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১৬২ পৃ.)

"অন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অন্তর্যামী
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি তা-ই পাই না তোমারে আমি॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১৭ পৃ.)

"খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ১৮৬ পৃ.)

"হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া
রবি শশী তারকায় তোমার জ্যোতি ভায়
রূপে রূপে তব অরূপ কায়া॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৬৪৬ পৃ.)

৩.১.৫ অন্যান্য ভক্তিমূলক গান

এসব বাদেও সনাতন ধর্মের আরও বিভিন্ন অনুষঙ্গ নিয়ে নজরুল গান রচনা করেছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মেগাফোনের প্রথম রেকর্ড প্রকাশিত হয়। প্রথম রেকর্ডে কবি জ্ঞান, সংগীত, শিল্পকলা, বিদ্যার দেবী সরস্বতী বন্দনা করে রচনা করেছেন–

"জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী
জয় বিশ্বলোক-বিহারিনী॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৬৮ পৃ.)

এছাড়াও দেবী সরস্বতীকে রচনা করেছেন–

"নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী বীণা পানি।
শতদল বাসিনী সিদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৯০ পৃ.)

সূর্যদেব কে নিয়ে নজরুল লিখেছেন-

"জবা কুসুম-সঙ্কাশ ঐ উদার অরুণোদয়।
অপগত তমোভয় জয় হে জ্যোতির্ময়॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৪২২ পৃ.)

রামচন্দ্র এবং সীতাদেবী কে নিয়েও নজরুল গান রচনা করেছেন-

"রঘু কুলপতি রামচন্দ্র আওধকে অধিকারী।
সুর-নর-জন-পূজে চরণ, মুনি- জন ভয়হারী॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৬০৭ পৃ.)

"কমলা রূপিণী, শক্তি স্বরূপিণী
পতিব্রতা সতী ধর্ম-বিধায়িনী-সীতা, জয় সীতা॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৪১৪ পৃ.)

শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সম্পর্কে নজরুলের রচনা-

"কাঁদবো না আর শচীদুলাল তোমায় ডেকে ডেকে
মোরা কাঁদব না-
(প্রিয়) তুমি গেছ চলে তোমার প্রেম গিয়েছ রেখে
তাই কাঁদব না॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ২৪০ পৃ.)

"এই যুগল মিলন দেখব বলে ছিলাম আশায় ব'সে
আমি নিত্যানন্দ হলাম, পিয়ে, মধুর ব্রজ-রসে॥"

(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৩৫৩ পৃ.)

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সম্পর্কে রচনা করেন-

"জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নমঃ
সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়-কারী নব-রূপে অবতার পুরুষ পরম॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৭১ পৃ.)

"পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার,
পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ লহ প্রণাম নমস্কার॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৯৮ পৃ.)

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে নজরুলের রচনা-

"জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর গৈরিকধারী
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৫৬৯ পৃ.)

মহাভারতের যুধিষ্ঠির, অর্জুন, কর্ণ প্রমুখ চরিত্রকে অবলম্বন করে নজরুল বেশ কিছু গান সৃজন করেছেন–

"তৃতীয় পান্ডব আমি নামেতে অর্জুন
যুধিষ্ঠির ছেড়েছেন অশ্ব, অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণ॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৯০০ পৃ.)

"কর্ণ ভীমে মহারণ, কুরুক্ষেত্র রণে
গগন আচ্ছন্ন হলো বাণে আর বাণে॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৯০০ পৃ.)

'কংস বধ'- কে কেন্দ্র করে নজরুল লিখেছেন–

"রাজা কংস মথুরাতে করে অত্যাচার
দুঃখে কষ্টে যত প্রজা করে হাহাকার॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৯০১ পৃ.)

'লক্ষ্মী-বন্দনা' করে নজরুলের রচনা–

"লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে সোনার ঝাঁপি লয়ে করে
কমল বনের কমলা গো বিহর হৃদি কমল পরে॥"
(নজরুল সংগীত সংগ্রহ, ৯২৩ পৃ.)

সনাতন ধর্ম সংগীত পর্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের রচনা একদিকে যেমন বিপুল অন্যদিকে বৈচিত্রময়তার নন্দিত নন্দন। এই বৈচিত্রের ব্যাপকতা এতটাই বিস্ময়কর যে তাতে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অপরদিকে কোন বাঙালি কবির রচনাকর্মে হিন্দুধর্ম সম্পৃক্ত বিষয়ের এমন বহুমুখী রূপায়ণ পূর্বে প্রত্যক্ষ হয়

নি। সনাতন ধর্মীয় গানের একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশাল অংশই নজরুলের রচনা। সেখানে একদিকে যেমন রাগসংগীতের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয় তেমনি খেয়াল, ঠুমরী সংগীত শৈলীর ব্যবহারও অতি ব্যাপক। ধ্রুপদ ও টপ্পা অঙ্গেও কয়েকটি উৎকৃষ্ট গান পাওয়া যায়। শ্যামা ও দুর্গাবিষয়ক সংগীতে খেয়াল সংগীতশৈলীর ব্যবহার বেশি অন্যদিকে কীর্তন বা শ্যামসংগীতে ঠুমরী ও ঠুমরী প্রভাবিত সংগীতশৈলীর ব্যবহার অধিক। এছাড়া কাজরী, হোরী, ঝুলন ইত্যাদি লঘুরাগসংগীত উত্তরভারতীয় লোকগীতির অনুসরণেও আরও কিছু গান রচিত হয়েছে। নজরুল রচিত সনাতন ধর্মীয় এ গানগুলো সুরগৌরবে, বাণীর মহিমায়, ছন্দ এবং বৈচিত্রে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং মহিমান্বিত।

৪র্থ অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের তালিকা

রশিদুন্ নবী-র সম্পাদনায় ২০১১ সালে নজরুল ইন্সটিটিউট থেকে প্রকাশিত নজরুল সংগীত সংগ্রহ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ৩১৭৪টি গান স্থান পেয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ৩১৭৪টি গান থেকে কাজী নজরুল ইসলামের ৮৫২টি সনাতন ধর্মীয় গান শ্রেণিবিভাজনের মাধ্যমে এই গবেষণায় নিরূপণ করা হল–

শ্যামাসংগীত

১. অনেক মানিক আছে শ্যামা তোর কালোরূপ সাগরজলে
২. আঁচলে হংস মিথুন আঁকা
৩. আঁধার ঘরের আলো ও কালো
৪. আজও মা তোর পাইনি প্রসাদ
৫. আদরিণী মোর কালো মেয়ে রে কেমনে কোথায় রাখি
৬. আমায় আঘাত যত হানবি শ্যামা
৭. আমায় আর কত দিন মহামায়া
৮. আমায় যারা দেয় মা ব্যথা
৯. আমার অহঙ্কারের মূল কেটে দে
১০. আমার কালীবাঞ্ছা কল্পতরুর ছায়াতলে আয় রে
১১. আমার কালো মেয়ে পালিয়ে বেড়ায়
১২. আমার কালো মেয়ে রাগ করেছে
১৩. আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে
১৪. আমার মা আছে রে সকল নামে
১৫. আমার মা যে গোপাল সুন্দরী
১৬. আমার মানস বনে ফুটেছে রে
১৭. আমার মুক্তি নিয়ে কি হবে মা
১৮. আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে
১৯. আমার হাতে কালি মুখে কালি
২০. আমার হৃদয় অধিক রাঙা মা গো
২১. আমার হৃদয় হবে রাঙাজবা দেহ বিল্বদল
২২. আমি কালী নামের ফুলের ডালি
২৩. আমি কালি যদি পেতাম কালী রইত না এ মনের কালি
২৪. আমি নামের নেশায় শিশুর মতো
২৫. আমি বেলপাতা জবা দেব না মাগো

২৬. আমি মা বলে যত ডেকেছি, সে ডাক নূপুর হয়েছে
২৭. আমি মুক্তা নিতে আসিনি মা
২৮. আমি রব না ঘরে
২৯. আমি শ্যামা বলে ডেকেছিলাম, শ্যাম হয়ে তুই কেন এলি
৩০. আমি হাত তুলেছি তোর পানে মা
৩১. আয় নেচে নচে আয় রে বুকে দুলালী মোর কালো মেয়ে
৩২. আয় মা চঞ্চলা মুক্তকেশী শ্যামা কালী
৩৩. আয় মা ডাকাত কালী
৩৪. আয় মুক্তকেশী আয় (মা)
৩৫. আর লুকাবি কোথা মা কালী
৩৬. এসো আনন্দিতা ত্রিলোক-বন্দিতা
৩৭. ও মা একলা ঘরে ডাকব না আর
৩৮. ওমা কালী সেজে ফিরলি ঘরে
৩৯. ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস
৪০. ওমা তোর চরণে কি ফুল দিলে
৪১. ওমা তোর ভুবনে জ্বলে এত আলো
৪২. ও মা ত্রিনয়নী; সেই চোখ দে
৪৩. ও মা দুঃখ অভাব ঋণ যত মোর
৪৪. ও মা নির্গুণের প্রসাদ দিতে
৪৫. ও মা বক্ষে ধরেন শিব যে চরণ
৪৬. ও মা যা কিছু তুই দিয়েছিলি
৪৭. ওগো মাগো আজো বেঁচে আছি
৪৮. ওরে আজই না হয় কালই তোরে কালী কালী বলতে হবে
৪৯. ওরে সর্বনাশী! মেখে এলি এ কোন চুলোর ছাই
৫০. ওরে হতভাগী রক্ত - খাগী, কোথায় ছিলি বল!
৫১. করুনা তোর জানি মাগো আসবে শুভদিন
৫২. কাঁদিস্‌নে আর কাঁদিস্‌নে মা, আমি মা তোর দুঃখ ঘুচাব
৫৩. 'কালী কালী' মন্ত্র জপি বসে শোকের ঘোর শ্মশানে
৫৪. কালো মেয়ের পায়ের তলায় (আমার কালো)
৫৫. কি নাম ধরে ডাকব তোরে মা তুই দে বলে
৫৬. কৃষ্ণা নিশীথ নাচে ঝিল্লির নুপুর বাজে
৫৭. কে তোরে কি বলেছে মা ঘুরে বেড়াস কালি মেখে
৫৮. কে পরালো মুন্ডমালা আমার শ্যামা মায়ের গলে
৫৯. কে বলে মোর মাকে কালো

৬০. কেঁদো না কেঁদো না মাগো কে বলেছো কালো
৬১. কেন আমায় আনলি মাগো মহাবাণীর সিন্ধুকূলে
৬২. কোথায় গেলি মাগো আমার
৬৩. ঘর ছাড়াকে বাঁধতে এলি কে মা
৬৪. চোখের বাঁধন খুলে দে মা
৬৫. জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছিস্ মা
৬৬. জয় মহাকালী, জয় মধু-কৈটভ বিনাশিনী
৬৭. জয় রক্তাম্বরা রক্তবর্ণা জয় মা
৬৮. জাগো শ্যামা জাগো শ্যামা আবার রণ-চন্ডী সাজে
৬৯. জ্বালো দেয়ালী জ্বালো
৭০. তারে আদর করে কালী বলি
৭১. তুই কালি মেখে জ্যোতি ঢেকে
৭২. তুই জগৎ জননী শ্যামা
৭৩. তুই বলহীনের বোঝা বহিস
৭৪. তোমার পূজার ফুল ফুটেছে মাগো
৭৫. তোর কালো রূপ দেখতে মাগো, কাল হ'ল মোর আঁখি
৭৬. তোর কালো রূপ লুকাতে মা বৃথাই আয়োজন
৭৭. তোর নামেরই কবচ দোলে দোলে আমার বুকে, হে শঙ্করী
৭৮. তোর রাঙা পায়ে নে মা শ্যামা আমার প্রথম পূজার ফুল
৭৯. তোরা মা বলে ডাক তোরা প্রাণ ভরে ডাক
৮০. ত্রিজগৎ আলো করে আছে কালো মেয়ের পায়ের শোভা
৮১. থির্ হয়ে তুই ব'স্ দেখি মা
৮২. দুর্গতি নাশিনী আমার শ্যামা মায়ের চরণ ধর
৮৩. দেখে যারে রুদ্রাণী মা সেজেছে আজ ভদ্রকালী
৮৪. নাচে নাচে রে মোর কালো মেয়ে নৃত্যকালী শ্যামা নাচে
৮৫. নিপীড়িতা পৃথিবী ডাকে জাগো চন্ডিকা মহাকালি
৮৬. নিশি কাজল শ্যামা আয় মা নিশীথ রাতে
৮৭. নীলবর্ণা নীলোৎপল নয়না শাকম্ভরী
৮৮. নৃত্যকালী শঙ্কর সঙ্গে নাচে
৮৯. নৃত্যময়ী নৃত্যকালী নিত্য নাচে
৯০. পাষানী মেয়ে! আয় আয় বুকে আয়
৯১. ফিরিয়ে দে মা ফিরিয়ে দে
৯২. বল্ মা শ্যামা বল্ তোর বিগ্রহ কি মায়া জানে
৯৩. বল্ রে জবা বল্

৯৪. বুঝি চাঁদের আর্শিতে মুখ দেখেছে কালো মেয়ে কালিকা
৯৫. ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা ভব ভয় হরা
৯৬. ভবানী শিবানী কালী করালী মুন্ডমালী
৯৭. ভারত শশ্মান হল মা, তুই শশ্মানবাসিনী ব'লে
৯৮. ভিখারিনী করে পাঠাইলি মোরে, (মাগো) কি দিয়ে পূজিব বল
৯৯. ভুবনময়ী ভবনে এসো সীমার মাঝে এসো অসীমা
১০০. ভুল করেছি ওমা শ্যামা বনের পশু বলি দিয়ে
১০১. মহাকালের কোলে এসে গৌরী হ'ল মহাকালী
১০২. মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী কালিকা
১০৩. মা! আমার মনে আমার বনে
১০৪. মা! আমি আর কি ভুলি
১০৫. মা আমি তোর অন্ধ ছেলে
১০৬. মা কবে তোরে পারব দিতে আমার সকল ভার
১০৭. মা খড়্গ নিয়ে মাতিস রনে নয়ন দিয়ে বহে ধারা
১০৮. মা তোর কালো রূপের মাঝে
১০৯. মা তোর চরন কমল ঘিরে চিত্ত ভ্রমর বেড়ায় ঘুরে
১১০. মা ব্রহ্মময়ী জননী মোর (মোরে) অব্রাহ্মণ কে বলে
১১১. মা মেয়েতে খেলব পুতুল আয় মা আমার খেলাঘরে
১১২. মাকে আদর করে কালী বলি
১১৩. মাকে আমার দেখেছে যে ভাইকে সে কি ঘৃণা করে
১১৪. মাগো আমি তান্ত্রিক নই তন্ত্র মন্ত্র জানি না মা
১১৫. মাগো আমি মন্দমতি তবু যে সন্তান তোরই
১১৬. মাগো কে তুই, কার নন্দিনী ভ্রমর ল'য়ে মা করিস খেলা
১১৭. মাগো চিন্ময়ী রূপ ধ'রে আয়
১১৮. মাগো তোমার অসীম মাধুরী বিশ্বে পড়িছে ছড়ায়ে
১১৯. মাগো তোরি পায়ের নূপুর বাজে
১২০. মাগো ভেবেছিস তোরই জবা চিরদিনই সইব
১২১. মাতল গগন- অঙ্গনে ঐ আমার রণ-রঙ্গিণী মা
১২২. মাতৃ নামের হোমের শিখা আমার বুকে কে জ্বালালো
১২৩. মায়ের অসীম রূপ সিন্ধুতে রে বিন্দুসম বেড়ায় ঘুরে
১২৪. মায়ের আমার রূপ দেখে যা মা যে আমার কেবল জ্যোতি
১২৫. মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী মিষ্টি বেশি মেয়ের চেয়ে
১২৬. মোর আদরিণী কালো মেয়ে শ্যামা নামে ডাকি
১২৭. মোরে মায়ার ডোরে বাঁধিস যদি মা

১২৮. যারা আজ এসেছে রইবে না কাল
১২৯. যে কালীর চরণ পায় রে কালীর চরণ পায়
১৩০. যে নামে মা ডেকেছিল সুরথ আর শ্রীমন্ত তোরে
১৩১. রক্ষাকালীর রক্ষা-কবচ আছে আমায় ঘিরে
১৩২. রাঙা জবার বায়না ধরে আমার কালো মেয়ে কাঁদে
১৩৩. রোদনে তার বোধন বাজে আয় মা শ্যামা জগন্ময়ী
১৩৪. শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা (তোরে) যায় না পাওয়া কেঁদে
১৩৫. শ্মশান কালীর নাম শুনে রে
১৩৬. শ্মশানে জাগিছে শ্যামা
১৩৭. শ্যামা তুই বেদেনীর মেয়ে তাই মাঠে ঘাটে বেড়াস ধেয়ে
১৩৮. শ্যামা তোর নাম যার জপমালা তার কি মা ভয় ভাবনা আছে
১৩৯. শ্যামা নামের ভেলায় চড়ে কাল-নদীতে দুলি
১৪০. শ্যামা নামের লাগল আগুন আমার দেহ ধূপ-কাঠিতে
১৪১. শ্যামা বড় লাজুক মেয়ে কেবলই সে লুকাতে চায়
১৪২. শ্যামা বলে ডেকেছিলাম, শ্যাম হয়ে তুই কেন এলি?
১৪৩. সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইল মাগো তুমি ফিরিলে না ঘরে

দুর্গাসংগীত ও আগমনী-বিজয়া গান

১. অন্নপূর্ণা মা এসেছে অন্নহীনের ঘরে
২. অসুর বাড়ীর ফেরত এ মা
৩. আঁধার ভীত এ চিতযাচে
৪. আজ উদার আকাশে ছুটির শঙ্খ-ঘন্টা বাজায় কে
৫. আজ শরতে আনন্দ ধরে না ধরণীতে
৬. আনন্দ রে আনন্দ, আনন্দ আনন্দ
৭. আমার আনন্দিনী উমা আজো
৮. আমার উমা কই গিরিরাজ
৯. আয় বিজয়া আয়রে জয়া উমার লীলা যারে দেখে
১০. আয় মা উমা! রাখবো এবার
১১. এই পৃথিবীতে এত শক্তির খেলা
১২. এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন
১৩. এলো রে এলো ঐ রণ রঙ্গিনী শ্রীচন্ডী
১৪. এলো রে শ্রী দুর্গা
১৫. এলো শারদশ্রী কাশ-কুসুম-বসনা
১৬. এলো শিবানী উমা এলো এলোকেশে

১৭. এসো মা দশভুজা
১৮. এসো মা পরমা শক্তিমতী
১৯. ও মা দনুজ দলনী
২০. ওরে আলয়ে আজ মহালয়া
২১. কী দশা হয়েছে মোদের দেখ মা উমা আনন্দিনী
২২. কে সাজালো মাকে আমার বিসর্জনের বিদায় সাজে
২৩. কেন মনে জাগে উদাসিনী গৌরী উমার স্মৃতি
২৪. কোন অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক জননী
২৫. চুরি করে এনো গিরি, আমার উমার দুই কুমারে
২৬. জননী! জননী! আবার জাগো শুভ্র শারদ প্রাতে
২৭. জয়-জগৎ-জননী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর
২৮. জয় দুর্গা, জননী, দাত্ত শক্তি
২৯. জয় দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী
৩০. জাগো দেবী দুর্গা, চন্ডিকা মহাকালী
৩১. জাগো যোগমায়া জাগো মৃন্ময়ী
৩২. জ্যোতির্ময়ী মা এসেছে আঁধার আঙিনায়
৩৩. তুই পাষাণ গিরির মেয়ে
৩৪. তুই মা হবি না মেয়ে হবি
৩৫. তোর মেয়ে যদি থাকতো উমা
৩৬. দীনের হতে দীন দুঃখী অধম যেথা থাকে
৩৭. ধানের ক্ষেতে ঢেউ লেগে আজ
৩৮. নাচে গৌরীদিবা হিম-গির দুহিতা
৩৯. নারায়ণী উমা খেলে হেসে হেসে
৪০. পরমা প্রকৃতি দুর্গে শিবে, গৌরী নারায়ণী লহ প্রনতি
৪১. প্রণমামী শ্রীদুর্গে নারায়ণী
৪২. বরষ গেল, আশ্বিন এলো, উমা এলো কই
৪৩. বিজয়োৎসব ফুরাইল মাগো! ফিরে আয় ফিরে আয়
৪৪. ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী
৪৫. মম আগমনে বাজে আগমনীর সানাই
৪৬. মহাদেবী উমারে আজি সাজাবো হর-রমা সাজে
৪৭. মা এলো রে, মা এলো রে বরষ পরে
৪৮. মা এসেছে, মা এসেছে, মা এসেছে রে
৪৯. মা তোর স্নেহ-প্রেম বন্যা ঝরে ঘরে ঘরে কন্যা হয়ে
৫০. মাকে আমার এলাম ছেড়ে মা অভয়া, মাকে দেখো

৫১. মাকে ভাসায়ে জলে কেমনে রহিব ঘরে
৫২. মাগো মহিষাসুর সংহারিণী
৫৩. মাতৃরূপা দয়ারূপা ষষ্ঠী মাগো নমো নমঃ
৫৪. যার মেয়ে ঘরে ফিরল না আজ তার ঘরে তুই যা মা উমা!
৫৫. যাস্‌নে মা ফিরে, যাস্‌নে জননী ধরি দুটি রাঙা পায়
৫৬. শূন্য বুকে ফিরে আয় ফিরে আয় উমা
৫৭. সতী মা কি এলি ফিরে ভোলানাথে ভুলাতে
৫৮. সুরধুনী ধারার মত সুধার সাগর পড়ুক ঝরে
৫৯. সোনার আলোর ঢেউ খেলে যায় মাঠের ঘাসে ঘাসে
৬০. সোনার বরণ মেয়ে আমার 'নন্দা' কোলে আয়

শিবসংগীত

১. অগ্নিগিরি ঘুমন্ত উঠিল জাগিয়া
২. অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী
৩. অশিব শক্তি হতে হে শঙ্কর
৪. আজি নাচে নটরাজ একি ছন্দে ছন্দে
৫. এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি
৬. ওঁ শঙ্কর হর হর শিব সুন্দর
৭. কে শিব সুন্দর শরত- চাঁদ চূড়
৮. জয়, আনন্দ-ভৈরব ডমরু পিনাক-পাণি
৯. জয় উমানাথ শিব মহেশ্বর
১০. জয় ভূতনাথ হে দেব প্রলয়ঙ্কর
১১. জয় মুক্তিদাত্রী কাশী বারানসী
১২. জয়-হরপ্রিয়া শিবরঞ্জনী
১৩. জাগো অরুণ-ভৈরব জাগো হে শিব-ধ্যানী
১৪. জাগো হে রুদ্র, জাগো রুদ্রাণী
১৫. টুটি স্বপন-বিলাস ফুটিল রৌদ্র-দগ্ধ মরুর কাতরতা
১৬. তুষার মৌলি জাগো জাগো গিরি রাজ
১৭. দুলে চরাচর হিন্দোল দোল
১৮. ধর হাত, নামিয়া এসো শিব-লোক হতে
১৯. নমো নটনাথ! হে নাট-দেউলে
২০. নমো নমো নমো নমঃ হে নটনাথ
২১. নাচিছে নটনাথ, শঙ্কর মহাকাল
২২. নাচে নটরাজ, মহাকাল

২৩. বিয়ে হয়েও সাজল না বৌ শিবানী মোর তেমনি আছে
২৪. ভগবান শিব জাগো জাগো
২৫. ভবানী শিবানী দশপ্রহরণধারিণী
২৬. যোগী শিব শঙ্কর ভোলা দিগম্বর
২৭. শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগ মায়া শঙ্করী শিবানী
২৮. শঙ্কর রূপে শ্যামল আওল
২৯. শঙ্কর সাজিল প্রলয়ঙ্কর সাজে রে
৩০. শান্ত হও, শিব, বিরহ-বিহ্বল
৩১. শিব অনুরাগিণী গৌরী জাগে
৩২. শিশু নটবর নেচে নেচে যায়
৩৩. সতী-হারা উদাসী ভৈরব কাঁদে
৩৪. সৃজন ছন্দে আনন্দে নাচো নটরাজ
৩৫. হর হর শঙ্কর! জয় শিব শঙ্কর

কৃষ্ণসংগীত

১. অন্তরে তুমি আছ, প্রেমময় ওহে হরি
২. অন্ধকারে দেখাও আলো কৃষ্ণ নয়ন-তারা
৩. অবেলায় যমুনার কূলে, কে আবার বাজায় লো বাঁশি
৪. অবেলাতে, জল আনিতে, সই লো সই পথে কালা
৫. অমন করে হাসিস্‌নে আর রাই লো
৬. আজ নন্দ দুলালের সাথে
৭. আজি নন্দলাল মুখ চন্দ নেহারি
৮. আজি পিয়াল ডালে বাঁধো বাঁধো ঝুলনা
৯. আজি প্রথম মাধবী ফুটিল কুঞ্জে মাধব এলো না সই
১০. আজি মনে মনে লাগে হোরী
১১. আজো হেথা তেমনি ধারা বাজে শ্যামের বাঁশির
১২. আনন্দ দুলালি ব্রজ-বালার সনে
১৩. আবির-রাঙা আভীরা নারী সনে
১৪. আমার নয়নে কৃষ্ণ নয়নতারা
১৫. আমার সকলি হরেছ হরি
১৬. আমার হৃদয় মন্দিরে ঘুমায় গিরিধারী
১৭. আমার হৃদয় বৃন্দাবনে নাচে রে গিরিধারী বনমালিয়া
১৮. আমি কৃষ্ণচূড়া হতাম যদি হতাম ময়ুর পাখা
১৯. আমি কেমন করে কোথায় পাব কৃষ্ণ চাঁদের দেখা

২০. আমি গিরিধারী মন্দিরে নাচিব
২১. আমি গিরিধারী সাথে মিলিতে যাইব
২২. আমি গো- রাখা রাখাল
২৩. আমি নূতন করে গড়ব ঠাকুর
২৪. আমি বাউল হলাম ধূলির পথে লয়ে তোমার নাম
২৫. আমি রচিয়াছি নব ব্রজধাম হে মুরারি
২৬. আয় ওলো সই, খেলব খেলা
২৭. আয় গোপিনী খেলবি হোরি
২৮. আয় ঘুম আয় ঘুম আয় মোর গোপাল ঘুমায়
২৯. আয় লো আয় লো লগন যায় লো
৩০. আর আমায় বাঁধিস না করে, ওগো ও মা নন্দরানী
৩১. আর কত দুখ দেবে বল মাধব বল
৩২. আর বাঁশি বাজাও না শ্যাম হে
৩৩. আহা রাধা সুন্দরী, রাধা সুন্দরী
৩৪. আহা রে বাঁশি রাধা নামে সাধা বাঁশি
৩৫. এ কি অপরূপ যুগল- মিলন হেরিনু নদীয়া ধামে
৩৬. এ কি অপরূপ রুপের কুমার হেরিলাম সখি যমুনা কূলে
৩৭. এ কি এ মধু শ্যাম বিরহে
৩৮. এ কি! একি বিপদ! এ কি বিপদ দয়াল নারায়ন
৩৯. এই যুগল মিলন দেখব বলে ছিলাম আশায় বসে
৪০. এলো শ্যামল কিশোর তমাল-ডালে বাঁধো ঝুলনা
৪১. এসো আনন্দ- সুন্দর ঘনশ্যাম
৪২. এসো নওল কিশোর এসো এসো
৪৩. এসো নূপুর বাজাইয়া যমুনা নাচাইয়া
৪৪. এসো প্রাণে গিরিধারী
৪৫. এসো মাধব এসো পিও মধু
৪৬. এসো মুরলীধারী বৃন্দাবন চারী
৪৭. এসো হৃদি-রাস-মন্দিরে
৪৮. ঐ কালো অঙ্গ রাঙ্গা হবে
৪৯. ঐ শ্যাম মুরলী বাজায়
৫০. ও কে উদাসী বেণু বাজায়
৫১. ও মন চল অকূল পানে
৫২. ও মা ফিরে এলে কানাই মোদের
৫৩. ও সে বাঁশরি বাজায় হেলে দুলে যায়

৫৪. ওগো এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে
৫৫. ওগো নন্দদুলাল নাচে ছন্দ তালে
৫৬. ওরে তরু তমাল শাখা
৫৭. ওরে দেখে যা তোরা নদীয়ায়
৫৮. ওরে নীল যমুনার জল
৫৯. ওরে বানর ময়ূর কোথায় পেলি
৬০. ওরে ব্যাকুল বেণুবন
৬১. ওরে মথুরাবাসিনী, মোরে বল
৬২. ওলো, কদম তলায় বাঁশি বাজে, বলে রাধা রাধা
৬৩. ওলো ননদিনী বল
৬৪. ওলো বিন্দে! গোবিন্দে আর দিসনে ব্যথা, দিসনে
৬৫. ওলো বিশাখা, ওলো ললিতে, দে এই পথের ধূলি দে
৬৬. ওহে, তোমরা মান করেছো দুজনায়
৬৭. ওহে নাগর শ্যাম কালাচাঁদ
৬৮. কর কৃপা গিরিধারী
৬৯. কলঙ্কে মোর সকল দেহ হলো কৃষ্ণময়
৭০. কল্যাণ দাও হে শ্যাম
৭১. কাঁদব না আর শচী দুলাল তোমায় ডেকে ডেকে
৭২. কাজরি গাহিয়া চল গোপ-ললনা
৭৩. কানাই রে কই তোর চূড়া বাঁশরি
৭৪. কারা পাষান ভেদি'জাগো নারায়ণ
৭৫. কিশোর গোপ বেশ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ
৭৬. কিশোরী সাধিকা রাধিকা শ্রীমতী
৭৭. কুমকুম আবীর ফাগের লয়ে কালিকা
৭৮. কুল রাখ না-রাখ তুমি সে জান
৭৯. কুসুম সুকুমার শ্যামল তনু
৮০. কৃষ্ণ কানাইয়া আয়ো মন্‌মে মোহন মুরলী বাজাও
৮১. কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল রসনা রাধা রাধা বল
৮২. কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল রে মন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বোল
৮৩. কৃষ্ণ মুরারি কৃষ্ণ মুরারি
৮৪. কৃষ্ণ যার সখা
৮৫. কৃষ্ণকে কালো বলো না
৮৬. কৃষ্ণচূড়ার মুকুট পরে এলো বনমালী
৮৭. কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি কৃষ্ণজি

৮৮. কৃষ্ণ-প্রিয়া লো! কেমনে যাবি অভিসারে?
৮৯. কৃষ্ণ প্রেমের ফুল ফুটেছে
৯০. কে গো তুমি বাঁশি হাতে, বাঁশুরিয়া
৯১. কেন ঝুলনাতে একেলা দোলে রাইকিশোরী
৯২. কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
৯৩. কেন প্রেম যমুনা আজি হলো অধীর
৯৪. কেন বাজাও বাঁশি কালোশশী মৃদু মধুর তানে
৯৫. কোন ঘাটে চান করলি কানাই
৯৬. কোন রস-যমুনার কূলে বেণু-কুঞ্জে
৯৭. খুলেছে আজ রঙের দোকান বৃন্দাবনে হোরির দিনে
৯৮. খেলে নন্দের আঙিনায় আনন্দ দুলাল
৯৯. গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে-কিশোর কৃষ্ণ দোলে বৃন্দাবন
১০০. গঙ্গার বালুতটে খেলিছে কিশোর গোরা
১০১. গভীর ঘুম ঘোরে স্বপনে শ্যাম-কিশোরে
১০২. গহন বনে শ্রীহরি নামের মোহন বাঁশি কে বাজায়
১০৩. গাও কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম
১০৪. গাও দেহে মন শুক-শারি
১০৫. গাহ নাম অবিরাম কৃষ্ণনাম কৃষ্ণনাম
১০৬. গিরিধারী গোপাল ব্রজ-গোপ-দুলাল
১০৭. গিরিধারী লাল কৃষ্ণ গোপাল
১০৮. গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা
১০৯. গোঠের রাখাল, বলে দেরে কোথায় বৃন্দাবন
১১০. ঘন ঘোর মেঘ-ঘেরা দুর্দিনে ঘনশ্যাম
১১১. ঘনশ্যাম কিশোর নয়ন আনন্দ
১১২. ঘন-শ্যামকে উদাসী হুঁ ম্যয়
১১৩. ঘরে আয় ফিরে, ফিরে আয় পথহারা
১১৪. চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন
১১৫. চঞ্চল সুন্দর, নন্দকুমার
১১৬. চল মন আনন্দধাম
১১৭. চাঁপার কলির তুলিকায়
১১৮. চির আনন্দে নন্দিত তুমি নন্দগোপাল
১১৯. চির আপনার তুমি হে হরি
১২০. চির কিশোর মুরলীধর কুঞ্জবন-চারী
১২১. ছি ছি ছি কিশোর হরি, হেরিয়া লাজে মরি

১২২. জগজন মোহন সঙ্কটহারী
১২৩. জপে ত্রিভুবন শ্রীকৃষ্ণকে নাম পবন জপে
১২৪. জয় নরনারায়ণ জয় পার্থসারথি
১২৫. জয় নারায়ণ অনন্ত রূপধারী বিশাল
১২৬. জয় পীতাম্বর শ্যাম সুন্দর মদন মনোহর কাননচারী
১২৭. জয়তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি
১২৮. জল ফেলে জল আনতে গেলি, ও লো কুলের রাধা
১২৯. জাগো জাগো গোপাল নিশি হ'ল ভোর
১৩০. জাগো জাগো শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী কাঁদে ধরিত্রী
১৩১. জাগো জাগো শঙ্খ-চক্রগদা-পদ্ম-ধারী, জাগো শ্রীকৃষ্ণ
১৩২. জাগো বৃষভানু নন্দিনী জাগো গিরিধারী
১৩৩. জাগো ব্যথার ঠাকুর ব্যথার ঠাকুর জাগো
১৩৪. ঝুলনের এই মধু লগনে
১৩৫. ঝুলনের হিন্দোলা দোলে, আনন্দ-কিশোর কোলে
১৩৬. ঝুলে কদমকে ডারকে ঝুলনা
১৩৭. তব বাঁশরি কি হরি শুনিতে পাব না
১৩৮. তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী
১৩৯. তুম্ আনন্দ ঘনশ্যাম
১৪০. তুম প্রেমকে হো ঘনশ্যাম
১৪১. তুমি আনন্দ ঘনশ্যাম আমি প্রেম-পাগলিনী রাধা
১৪২. তুমি কাঁদাইতে ভালোবাস আমি তাই নিশিদিন কাঁদি
১৪৩. তুমি কি পাষাণ বিগ্রহ শুধু কহ গিরিধারী কহ
১৪৪. তুমি দিয়েছ দুঃখ-শোক বেদনা
১৪৫. তুমি দুখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি
১৪৬. তুমি নামো হে নামো শ্যামো
১৪৭. তুমি পিরিতি কি কর হে শ্যাম
১৪৮. তুমি বেনুকা বাজাও কার নাম লয়ে শ্যাম
১৪৯. তুমি যদি রাধা হতে শ্যাম
১৫০. তোমা বিনা মাধব রহিতে পারি না আর
১৫১. তোমার কালো রূপে যাক না ডুবে সকল কালো মম
১৫২. তোমার নামের মহিমা শ্রীহরি নাহি হয় যেন ম্লান
১৫৩. তোমার মদন মোহন রূপেরই দোষ
১৫৪. তোমার লীলারসে হে কৃষ্ণ গোপাল ডুবিয়ে রাখ মোরে
১৫৫. তোমার সৃষ্টি মাঝি হরি হেরিতে যে নিতি পাই তোমায়

১৫৬. তোমার আশায় তেয়াগিনু সব সুখ
১৫৭. তোমারি চরনে শরন যাচি হে নারায়ণ
১৫৮. তোরা দেখে যা আমার কানাই সেজেছে
১৫৯. তোরা বলিস লো সখি, মাধবে মথুরায়
১৬০. তোরা যা লো সখি মথুরাতে
১৬১. তোরে সেই দেশে লয়ে যাব
১৬২. থির সৌদামিনী থির কৃষ্ণ মেঘে অপরূপ শোভা
১৬৩. দাও দাও দরশন পদ্ম-পলাশ-লোচন
১৬৪. দাও দেখা দাও দেখা হরি পদ্ম পলাশ-লোচন
১৬৫. দাসী হতে চাই না আমি হে শ্যাম কিশোর বল্লভ
১৬৬. দিত্ত বর হে মোর স্বামী যবে যাই আনন্দ ধামে
১৬৭. দুঃখ ক্লেশ-শোক-পাপ-তাপ শত
১৬৮. দোল ফাগুনের দোল লেগেছে
১৬৯. দোলন-চাঁপা বনে দোলে
১৭০. দোলে ঝুলন দোলায় দোলে নওল কিশোর
১৭১. দোলে নিতি নব রূপের ঢেউ-পাথার
১৭২. দোলে বন-তমালের ঝুলনাতে কিশোরী-কিশোর
১৭৩. দ্বারকার সাগর তীর হতে সই
১৭৪. ধারাজলের ঝালর ঢাকা শ্যাম চাঁদের মুখ
১৭৫. ধ্যান ধরি কিসে হে গুরু
১৭৬. নওল কিশোর শ্যামল এলো মধু জ্যোৎস্নায় নাহিয়া
১৭৭. নওল শ্যাম তনু গোরীর পরশে
১৭৮. নন্দকুমার বিনে সই আজি বৃন্দাবন অন্ধকার
১৭৯. নন্দ-দুলাল নাচে, নাচেরে হাতে সরের নাড়ু নিয়ে নাচে
১৮০. নন্দ-দুলাল পিয়াল-তমাল বনচারী
১৮১. নন্দলোক হতে (আনন্দলোক হতে) আমি এনেছি রে মহামায়ায়
১৮২. নব কিশলয় শ্যামা তনু ঢল ঢল অভিরাম
১৮৩. নব নীরদ ঘনশ্যাম হে
১৮৪. নবনীত সুকোমল লাবনি তব শ্যাম
১৮৫. নমি গোকুল-গোপাল গোবিন্দ
১৮৬. নমো নারায়ণ অনন্ত লীলা সিন্ধু বিশাল
১৮৭. নমো যাদব নমো মাধব নমো দ্বারকা পতি
১৮৮. নহ কলঙ্কিনী, নহ কলঙ্কিনী
১৮৯. না মিটিতে মনোসাধ যেয়ো না হে শ্যামচাঁদ

১৯০. নাচিয়া নাচিয়া এসো নন্দদুলাল
১৯১. নাচে ঐ আনন্দে নন্দ-দুলাল
১৯২. নাচে নন্দ-দুলাল নদীতরঙ্গে
১৯৩. নাচে যশোদাকে আঙনামে শিশু গোপাল
১৯৪. নাচে শ্যাম সুন্দর গোপাল নটবর
১৯৫. নাচো বনমালী করতালি দিয়া
১৯৬. নাচো শ্যাম-নটবর কিশোর মুরলীধর
১৯৭. নারায়ণ! নারায়ণ!
১৯৮. নীল যমুনা সলিল কান্তি চিকন ঘনশ্যাম
১৯৯. নীল যমুনার কদম তলে বাঁশি বাজে গো
২০০. নীল হরি এসো নীলে হিরণে সেজে মন হরিতে
২০১. নূপুর মধুর রুনুঝুনু বোলে
২০২. পথে কি দেখলে যেতে আমার গৌর দেবতারে
২০৩. পথে পথে কে বাজিয়ে চলে বাঁশি
২০৪. পথের সঙ্কটে কন্টকে সখি কৃষ্ণ প্রেমময়ী মরে না
২০৫. প্রাণে দিও না ব্যথা, ওহে রাধা বিনোদিনী
২০৬. প্রিয়তম হে, আমি যে তোমারি চির-আরাধিকা
২০৭. প্রেম অনুরাগে শ্রী-মুখ উজ্জ্বল
২০৮. ফিরে আয় ঘরে ফিরে আয়
২০৯. ফিরে আয় ভাই গোঠে কানাই
২১০. ফিরে এলো সেই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি
২১১. ফিরে যা সখি ফিরে যা ঘরে
২১২. ফিরে যাও গৌর সুন্দর চঞ্চল মতি
২১৩. বঁধু আমার ভুবন ঘিরিল যখন
২১৪. বঁধু ফিরে এসো, আজো প্রাণের প্রদীপ রেখেছি
২১৫. বকুল তলে ব্যাকুল বাঁশি কে বাজায়
২১৬. বড়ায়ি লো সহিতে পারি না আর
২১৭. বন তমালের শ্যামল ডালে দোলে
২১৮. বনমালার ফুল জোগালি বৃথাই বন-লতা
২১৯. বনে চলে বনমালী বনমালা দুলায়ে
২২০. বনে বনে খুঁজি মনে মনে খুঁজি
২২১. বনে যায় আনন্দ দুলাল
২২২. বরষার দিন তো হয়ে গেছে সারা তবু কেন ঝরে বাদল
২২৩. বর্ণচোরা ঠাকুর এলো রসের নদীয়ায়

২২৪. বল দেখি মা নন্দরানী ওগো গোকুলবালা
২২৫. বলি ওলো রাধে দেখ্‌বি আয়
২২৬. বাঁকা শ্যাম হে তোমায় পেয়েছি আজ খুঁজে
২২৭. বাঁকা শ্যামল এলো বন-ভবনে
২২৮. বাঁধিয়া দুইজনে দুঁহু ভুজ বন্ধনে কাঁদিছে শ্যাম রাই
২২৯. বাঁশরি বাজে দূর বন মাঝে উদাস সুরে ঝুরে ঝুরে
২৩০. বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা
২৩১. বাঁশির কিশোর ব্রজগোপী চিত-চোর
২৩২. বাজিয়ে বাঁশি মনের বনে এসো কিশোর বংশীধারী
২৩৩. বাজো বাঁশরি, বাজো বাঁশরি, বাজো বাঁশরি, সেই চির চেনা সুরে
২৩৪. বাদলা রাতে চাঁদ উঠেছে কৃষ্ণ মেঘের কোলে রে
২৩৫. বিজন গোঠে কে রাখাল বাজায় বেণু
২৩৬. বিদায় দে মা একবার দেখে আসি
২৩৭. বৃন্দাবনী কুমকুম আবির রাগে যেন মোর অন্তর বাহির রাঙ্গে
২৩৮. বৃন্দাবনে এ কি বাঁশরি বাজে
২৩৯. বেলা গেল ও ললিতে, কৃষ্ণ এলো না
২৪০. ব্রজ কুমার গিরিধারী শ্যাম কিশোর
২৪১. ব্রজগোপাল শ্যাম সুন্দর
২৪২. ব্রজগোপী খেলে হোরি
২৪৩. ব্রজ দুলাল ঘন শ্যাম
২৪৪. ব্রজপুর-চন্দ্র পরম সুন্দর
২৪৫. ব্রজ-বনের ময়ূর! বল কোন বনে শ্যামের নূপুর বাজে
২৪৬. বজ্র শ্যাম হে আর জনমে হয়ো রাধা
২৪৭. ব্রজে আবার আসবে ফিরে আমার ননী চোরা
২৪৮. মন্ডলী রচিয়া ব্রজের গোপীগণ
২৪৯. মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে
২৫০. মদনমোহন শিশু নটবর শ্যামল সুন্দর যশোদা-দুলাল
২৫১. মম বন-ভবনে ঝুলন দোলনা
২৫২. মম মধুর মিনতি শোন ঘনশ্যাম গিরিধারী
২৫৩. মাধব গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ মুরারি
২৫৪. মাধব বংশীধারী বনওয়ারী গোঠ-চারী গোবিন্দ কৃষ্ণ মুরারি
২৫৫. মেরে তন্‌কে তুম অধিকারী ও পীতাম্বরধারী
২৫৬. মেরে মন মন্দিরমে শুনো স্যখিরি শোওত হায় গিরধারী
২৫৭. মেরে শ্রীকৃষ্ণ ধরম শ্রীকৃষ্ণ করম শ্রীকৃষ্ণহি তন-মন-প্রাণ

২৫৮. মোর ঘনশ্যাম এলে কি আজ কালো মেঘের বেশে
২৫৯. মোর পুষ্প পাগল মাধবী-কুঞ্জে এইত প্রথম মধুপ গুঞ্জে
২৬০. মোর বেদনার কারাগারে জাগো, জাগো- বেদনাহারী হে মুরারি
২৬১. মোর মন ছুটে যায় দ্বাপর যুগে দূর দ্বারকায় বৃন্দাবনে
২৬২. মোর শ্যাম সুন্দর এসো
২৬৩. মোর হৃদয় দোলায় দোলে ঘনশ্যাম
২৬৪. মোরা কুসুম হয়ে কাঁদি কুঞ্জবনে
২৬৫. মোরা ভেসে যাব কৃষ্ণ নামের স্রোতে গো
২৬৬. মোরে সেইরূপে দেখা দাও হরি
২৬৭. যমুনা-কূলে মধুর মধুর মুরলী সখি বাজিল
২৬৮. যমুনার জল দ্বিগুন হয়েছে চাঁদ কি উঠেছে গগনে?
২৬৯. যা যা লো বৃন্দে মথুরাতে দেখে আয় কেমন আছে শ্যাম
২৭০. যূথিকা মাধবী মল্লিকা লহ শ্যাম হে
২৭১. যে অঙ্গুলিতে রং গুলিয়াছ এত কুঙ্কুম ফাগ
২৭২. যৌবনে যোগিনী সাজিয়া লো সজনী
২৭৩. রঙ্গিলা আপনি রাধা তারে হোরির রঙ দিও না
২৭৪. রস- ঘনশ্যাম-কল্যাণ- সুন্দর
২৭৫. রাই বিনোদিনী দোলে ঝুলন দোলায়
২৭৬. রাখ রাখ রাঙা পায়, হে শ্যামরায়
২৭৭. রাধাকৃষ্ণ নামের মালা জপ দিবানিশি নিরালা
২৭৮. রাধা-তুলসী, প্রেম- পিয়াসী, গোলকবাসী শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ
২৭৯. রাধা শ্যাম-কিশোর প্রিয়তম কৃষ্ণগোপাল
২৮০. রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম রাধা শ্যাম
২৮১. রাধে, তোর খাঁটি প্রেমের ভালোবাসা মাটিতে লুটায়
২৮২. রাসমঞ্চে দোল-দোল লাগে রে
২৮৩. রাস-মঞ্চোপরি দোলে মুরলীধারী নটবর সুন্দর শ্যাম
২৮৪. রিনিকি ঝিনিকি রিনিরিনি রিনি ঝিনি ঝিনি বাজে পায়েলা
২৮৫. রূপের পেখম খুলে ময়ূরীর প্রায়
২৮৬. ললাটে মোর তিলক এঁকো মুছে বঁধুর চরণ-ধূলি
২৮৭. লীলা রসিক শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অন্ত কে পায়
২৮৮. লুকোচুরি খেলতে হরি হার মেনেছে আমার সনে
২৮৯. লোকে বলে রাধিকা সে কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
২৯০. শুক সারি সম তনু মন মম নিশিদিন গাহে তব নাম
২৯১. শোনালো শ্রবনে শ্যাম শ্যাম নাম

২৯২. শোনো ঘনশ্যাম বনবাসী
২৯৩. শোনো ডাকে রে ঐ ডাকে মোরে
২৯৪. শোনো মেঘ- ঘনশ্যাম ডাকে আমারে
২৯৫. শোনো লো বাঁশিতে ডাকে আমারে শ্যাম
২৯৬. শোনো হে রাধিকে, বলি হে তোমাকে, কেন অভিসারে নাহি যাও
২৯৭. শ্যাম মুখ আর না হেরব সজনী
২৯৮. শ্যাম সুন্দর- গিরিধারী
২৯৯. শ্যাম সুন্দর মন- মন্দিরমে আও আও
৩০০. শ্যামল তুমি শ্যাম তাই এ ধরাধাম সাজায়েছ শ্যাম সুষমায়
৩০১. শ্যামে হারায়েছি বলে কাঁদি না বিশাখা
৩০২. শ্যামের সাথে চল সখি খেলি সবে হোরি
৩০৩. শ্রীকৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম থির হও অধীর চিত্ত ওরে
৩০৪. শ্রীকৃষ্ণ নাম মোর জপ মালা নিশিদিন
৩০৫. শ্রীকৃষ্ণ নামের তরীতে কে হবি পার
৩০৬. শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদাপদ্মধারী
৩০৭. শ্রীকৃষ্ণ রূপের কর ধ্যান অনুক্ষণ
৩০৮. সখি আমি যেন রূপ- মঞ্জরি
৩০৯. সখি এবার রাধার আধার ভাঙিয়া মিশিব হরির সঙ্গে
৩১০. সখি ঐ শোনো বাঁশি বাজে
৩১১. সখি, কৃষ্ণ দরশনে যাব
৩১২. সখি গো বৃথা প্রবোধ-দিস্‌নে
৩১৩. সখি নবীন নীরদে ছাইল গগন, নব ঘন শ্যাম কই
৩১৪. সখি বাঁধো লো বাঁধো লো ঝুলনিয়া
৩১৫. সখি যায়নি ত শ্যাম মথুরায়
৩১৬. সখি শ্যামের স্মিরিতি শ্যামের পিরিতি মম জীবন মরণের সাথি
৩১৭. সখিরা শোন শোন ঐ দূরে বাজে বাঁশরি
৩১৮. সদা হরিরস মদিরায় মাতাল যে জন
৩১৯. সোনার হিন্দোলে কিশোর কিশোরী দোলে
৩২০. হোরি খেলে নন্দলালা, প্রেমের রঙে মাতোয়ালা
৩২১. হোরি নাচত নন্দদুলাল
৩২২. হরি নামে সুধায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারি
৩২৩. হোরি মোরে হোরির রঙ দিওনা, আপনি রঙ্গীলা আমি
৩২৪. হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতী দেশে
৩২৫. হাসিয়া মরি রাই কৃষ্ণ শ্যাম নাই যাবি হেন কোন দেশে

৩২৬. হৃদি পদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম

৩২৭. হে নিঠুর ! তোমাতে নাই আশার আলো

৩২৮. হে পার্থ সারথি! বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ

৩২৯. হে প্রবল দর্পহারী কৃষ্ণ মুরারি

৩৩০. হেলে দুলে চলে বন-মালা গলে গোঠ বিহারী বনে বনমালী সাজে

৩৩১. হেলে দুলে বাঁকা কানাইয়া গোকুলে চলে

৩৩২. হোরির মাতন লাগল আজি রে

৩৩৩. হোরির রঙ লাগে আজি গোপিনীর তনু মনে।

কীর্তন

১. আমি কলহেরি তরে কলহ করেছি

২. আমি কি সুখে লো গৃহে রবে

৩. এলো কৃষ্ণ কানাইয়া তমাল বনে

৪. কেন মরিতে আসিলাম যমুনায়

৫. কেন হেরিলাম নব ঘনশ্যাম

৬. ঝাঁপিয়া অঞ্চলে কেন বিধুবদন অবনত কাছে নয়ান

৭. দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে

৮. নব কিশলয় রাঙ্গা শয্যা পাতিয়া

৯. নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়া রহিয়া চায়

১০. নিশি ও প্রভাতে মিলন লগন

১১. ফুটিল মানস-মাধবী-কুঞ্জে প্রেম কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে

১২. ফোটে কমল কেমন করে

১৩. বঁধু আঁখি জলে কস্তুরী-চন্দন ঘষিনু

১৪. বঁধু কি ক্ষনে হল দেখা

১৫. বঁধু সেদিন নাহিক আর

১৬. বাজে মঞ্জুল মঞ্জির রিনিকি ঝিনি

১৭. ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার আসবে ফিরে কবে?

১৮. মণি-মঞ্জির বাজে অরুণিত চরনে

১৯. মুরলী শিখিব বলে এসেছি কদম্ব তলে

২০. মোর মাধব-শূন্য মাধবী কুঞ্জে

২১. যা সখি যা তোরা গোকুলে ফিরে

২২. রাই জাগো রাই জাগো বলে কেঁদে কেঁদে ডাকে

২৩. সখা অসীম আকাশ দিক হারায়েছে রাধা হারায়নি দিক

২৪. সখি আমি-ই না হয় মান করেছিনু

২৫. সখি তখন আমার বালিকা বয়স বেণু শুনেছিনু যবে
২৬. সখি দেখ লো বাহিরে গিয়া
২৭. সখি বল কোন দেশে যাই
২৮. সখি সাজায়ে রাখ্ লো পুষ্প বাসর
২৯. সখি সে হরি কেমন বল্
৩০. সখি সেইত পুষ্প শোভিতা হ'ল আবার মাধবীলতা
৩১. সাজে অভিনব সাজে রাই, শ্যাম পাগলিনী
৩২. সুবল সখা ! এই দেখ্ এই পথে তাহার

ভজন

১. অনাদিকাল হতে অনন্তলোক গাহে তোমারি জয়
২. অন্তরে তুমি আছ চিরদিন ওগো অন্তর্যামী
৩. অন্তরে প্রেমের দীপ জ্বলে যার
৪. অন্ধকারের তীর্থপথে ভাসিয়ে দিলাম নামের তরী
৫. অরুণ কিরণ সুধা স্রোতে, ভাসাও প্রভু মোরে
৬. আঁধার রাতে দেবতা মোর এসে চলে গেছে
৭. আজ গেছ ভুলে!
৮. আমাদের ভালো কর, হে ভগবান
৯. আমায় যারা ঘিরে আছে
১০. আমায় রাখিসনে আর ধ'রে
১১. আমার বিফল পূজাঞ্জলি
১২. আমার যারা আশ্রিত নাথ
১৩. আমার লীলা বোঝা ভার
১৪. আমারে চরনে দিত্ত ঠাই
১৫. আমি বাঁধন যত খুলিতে চাই জড়িয়ে পড়ি তত
১৬. আমি বুকের ভিতর থাকি তবু ওরা ডাকে
১৭. এ দেবদাসীর পূজা লহ হে ঠাকুর
১৮. এসেছি তব দ্বারে ভক্তি-শূন্য প্রাণে
১৯. ওগো অন্তর্যামী ভক্তের তব শোন শোন নিবেদন
২০. ওগো দেবতা তোমার পায়ে গিয়াছিনু ফুল দিতে
২১. ওগো পূজার থালায় আছে আমার
২২. ওরে আবোধ আঁখি! আর কতদিন রইবি রূপে ভুলে
২৩. ওরে আয় অশুচি আয়রে পতিত এবার মায়ের পূজা হবে
২৪. ওরে যোগ সাধনা পরে হবে নাম জপ তুই আগে

২৫. ওরে রাখাল ছেলে বল্ কি রতন পেলে
২৬. কত আর এ মন্দির দ্বার, হে প্রিয়, রাখিব খুলি'
২৭. কান্ডারি গো কর কর পার
২৮. কি দিয়ে পূজি ভগবান
২৯. কেন বারে বারে আমি এসে ফিরে যাই তাহারি দুয়ারে
৩০. কেহ বলে তুমি রূপ সুন্দর
৩১. কোথায় তুই খুঁজিস ভগবান, সে যে রে তোরই মাঝে রয়
৩২. কোন কুসুমে তোমায় আমি পূজিব নাথ বল বল
৩৩. কোন ঘর-ছাড়া বিবাগীর বাঁশি শুনে উঠেছিলে জাগি
৩৪. কোন মহাব্যোমে ধ্বনি ওঠে ওম্, আদি আকাশবাণী
৩৫. খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে
৩৬. খোলো মা দুয়ার খোলো
৩৭. গগনে প্রলয় মেঘের মেলা জীবন ভেলা দোলে টলমল
৩৮. গম্ভীর আরতি নৃত্যের ছন্দে
৩৯. চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়
৪০. চিরদিন পূজা নিয়েছ দেবতা
৪১. জগতের নাথ কর পার হে
৪২. জগতের নাথ তুমি, তুমি প্রভু প্রেমময়
৪৩. জপ্ লে রে মন মেরা প্রভুকে নামকে মালা
৪৪. জবা কুসুম-সঙ্কাশ ঐ উদার অরুণোদয়
৪৫. জয় বিগলিত- করুনা রূপিনী গঙ্গে
৪৬. জয় ব্রহ্ম বিদ্যা শিব সরস্বতী
৪৭. জয় হর-পাবর্তী জয় শক্তি
৪৮. ঠাকুর তোমায় মালা দেব
৪৯. ডাকতে তোমায় পারি যদি
৫০. তা'র কে পড়িল গৌর অঙ্গ
৫১. তুমি আমারে কাঁদাও নিজেরে আড়াল রাখি
৫২. তুমি দিলে দুঃখ অভাব তুমিই কর ত্রান
৫৩. তুমি বিরাজ কোথা হে উৎসব দেবতা
৫৪. তুমি যুগে যুগে নাথ আসিলে
৫৫. তুমি লহ প্রভু আমার সংসারেরি ভার
৫৬. তুমি সুন্দর কপট হে নাথ
৫৭. তুমি সুন্দর যবে নবরূপ ধর হও সুন্দরতর
৫৮. তোমার আঘাত শুধু দেখলো ওরা

৫৯. তোমার দেওয়া ব্যথা, সে যে তোমার হাতের দান
৬০. তোমার প্রেমে সন্দেহ মোর দুর কর নাথ ভক্তি দাও
৬১. তোমার বানীর মূর্ছনাতে বাজাও আমার বাণী
৬২. তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় না তো কভু
৬৩. তোর জননীরে কাঁদাতে কি মেয়ে হয়ে এসেছিলি
৬৪. তোর স্নেহ- প্রেম-বন্যা ঝরে (মা)
৬৫. ত্রিভুবনবাসী যুগল মিলন দেখরে দেখ চেয়ে
৬৬. থাক্ এ-গৃহ ঘিরিয়া সদা মঙ্গল কল্যাণ হে ভগবান
৬৭. থেকো প্রিয় পাশে সাঁঝ-পাখা আসে নেমে
৬৮. দাও শক্তি প্রেম ভক্তি
৬৯. দিত্ত এই বর
৭০. দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ হে নাথ
৭১. দুর্জয় অভিমান ত্যজ ত্যজ রাধে
৭২. দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা
৭৩. দেব আর্শীবাদ লহ সতী পুণ্যবতী
৭৪. দেবতা কোথায় স্বর্গের পানে চাহি
৭৫. দেবতা গো, দ্বার খোলো
৭৬. দোলে প্রাণের কোলে প্রভুর নামের মালা
৭৭. ধূলার ঠাকুর, ধূলার ঠাকুর! তোমার সাতে করব খেলা
৭৮. নাথ সহজ কর লঘু কর এই জীবনের ভার
৭৯. নাম জপের গুনে ফল্‌ল ফসল চোখ মেল দেখ আজ
৮০. নিত্য শুদ্ধ কল্যাণরূপে আছ তুমি মোর সাথে
৮১. নিপীড়িতা পৃথিবীকে কর কর ত্রাণ
৮২. নীরব সন্ধ্যা, নীরব দেবতা খোলো মন্দির দ্বার
৮৩. পঞ্চ প্রাণের প্রদীপ শিখায় লহ আমার শেষ আরতি
৮৪. পরমাত্মা নহ তুমি মোর (তুমি) পরমাত্মীয় মোর
৮৫. পাপে তাপে মগ্ন আমি জানি জানি তবু
৮৬. পাষাণ যদি হতে তুমি অনেক আগে গলে যেতে
৮৭. পূজা দেউলে মুরারি, শঙ্খ নাহি বাজে
৮৮. প্রভু তোমাতে যে করে প্রাণ নিবেদন ভয় নাহি আর তার
৮৯. প্রভু তোমারে খুঁজিয়া মরি ঘুরে ঘুরে বৃথা দূরে চেয়ে থাকি
৯০. প্রভু রাখ এ মিনতি ত্রিভুবন পতি তব পদে মতি
৯১. প্রভু সংসারেরি সোনার শিকল বেঁধো না আর পায়
৯২. প্রাণের ঠাকুর লীলা করে

৯৩. প্রেম অনুরাগ শ্রী কান্তি মধুর হে চির সুন্দর
৯৪. প্রেমের প্রভু ফিরে এসো, শিখাও আবার ক্ষমা
৯৫. বন্দীর মন্দিরে জাগো দেবতা
৯৬. বহু পথে বৃথা ফিরিয়াছি প্রভু হইব না আর পথহারা
৯৭. বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ তুমি জেনে শান্তি ত' নাহি পাই
৯৮. বিষ্ণুসহ ভৈরব অপরূপ মধুর মিলন
৯৯. বেদনার বেদীতলে পেতেছি আসন, হে দেবতা
১০০. ব্যথিত প্রাণ দানো শান্তি, চিরন্তন, ধ্রুব- জ্যোতি
১০১. ভক্ত নরের কাছে হে নারায়ণ
১০২. ভুলে রইলি মায়ায় এসে ভবে
১০৩. ভেঙো না ভেঙো না ধ্যান হে আমার ধ্যানের দেবতা
১০৪. মধুর আরতি তব বিশ্ব-সভাতে
১০৫. মন লহ নিতি নাম রাধা শ্যাম গাহো হরি গুণ গান
১০৬. মনে যে মোর মনের ঠাকুর তারেই আমি পূজা করি
১০৭. মম জনম মরণের সাথী
১০৮. মম প্রাণ শতদল হোক প্রণামী কমল (ওগো) তব চরণে
১০৯. মিলন গোধুলি রাঙা হয়ে এলো ঐ
১১০. মুক্তি আমায় দিলে হে নাথ মোর যে প্রিয় তারে নিয়ে
১১১. মৃত্যুর যিনি মৃত্যু, আমি শরণ নিয়াছি তাঁর
১১২. মোর প্রিয়জনে হরণ করে তুমি প্রিয় হলে
১১৩. মোরে পূজারী কর তোমার ঠাকুর ঘরে হে ত্রিজগতের নাথ
১১৪. মৌন আরতি তব বাজে নিশিদিন
১১৫. যত নাহি পাই দেবতা তোমায়, তত কাঁদি আর পূজি
১১৬. যদি আমি তোমায় হারাই, তুমি যেয়ো না নাথ হারিয়ে
১১৭. যুগ যুগ ধরি লোকে লোকে মোর
১১৮. যে পাষাণ হানি বারে বারে তুমি আঘাত করেছ
১১৯. যেন ভোরে জাগি তব নাম গেয়ে
১২০. শোক দিয়েছ তুমি হে নাথ তুমি এ প্রাণে শান্তি দাও
১২১. সকাল সাঁঝে প্রভু সকল কাজে উঠুক তোমারি নাম
১২২. সখি কই গোপীবল্লভ শ্যামল পল্লব কান্তি
১২৩. সখি রাধা রাধা নামে বাজে বাঁশরি
১২৪. সখি রে আমি তো নিয়েছি বঁধুরে কিনে
১২৫. সীতা, সীতা, সীতা মোর নয়নের তারা
১২৬. সুখ দিনে ভুলে থাকি, বিপদে তোমারে স্মরিয়া

১২৭. সৃজন ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
১২৮. স্নিগ্ধ শ্যাম কল্যাণ রূপে রয়েছে মোদেরে ঘেরি
১২৯. হরি হে তুমি তাই দূরে থাক স'রে
১৩০. হে কৃষ্ণ চাঁদ দাসীর হৃদয়ে কখন উদয় হবে?
১৩১. হে গোবিন্দ ও অরবিন্দ চরণে শরণ দাও হে
১৩২. হে গোবিন্দ রাখ চরণে
১৩৩. হে গোবিন্দ, হে গোবিন্দ
১৩৪. হে চির সুন্দর, বিশ্ব চরাচর তোমারি মনোহর রূপের ছায়া
১৩৫. হে দুখ-হরণ ভক্তের শরণ

অন্যান্য ভক্তিমূলক গান

১. অগ্নি–ঋষি! অগ্নি বীণা তোমায় শুধু সাজে
২. অঙ্গাধীপ মহারাজ, আমি চাই দান
৩. আমার হরিনামে রুচি
৪. আমি কর্ণ অঙ্গাধীপ, দাতা বলে মোরে
৫. আমি কর্ণ সেনাপতি; কুরুক্ষেত্র রনে
৬. আমি কুন্তী, ভোজ কন্যা ছিনু ভোজপুরে
৭. আমি নহি শুধু পান্ডব জননী
৮. আমি সূর্য, তব পিতা, তুমি সুত মোর
৯. আয় কর্ণ, আয় মোর সাথে ত্যাজি দুর্যোধন
১০. ইন্দ্রজিৎ মোর নাম, জানে দেবকুল
১১. উঠ, উঠ, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্বুবান
১২. একি! ঐ ঐ দূরে, কর্ণের পাশে জননীরে দেখি
১৩. একি! কিছুই বুঝিতে নারি। কর্ণ অগ্রজ সহোদর
১৪. একি দেবী, তব এ চরনপদ্ম, মোর চরণসম
১৫. একি? পান্ডব জননী! তুমি হেথা মোর কাছে
১৬. একি হেরি! রণভূমে, ধূলায় পড়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ
১৭. এখন জানিনু আমি নহে সূত সুত
১৮. এসো এসো বুকে ধরি, মিত্র বিভীষণ
১৯. এসো কল্যাণী চির আয়ুষ্মতী
২০. এসো গো মা সরস্বতী সর্বমঙ্গলা
২১. এসো বিদ্রোহী মিথ্যা সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধবীর
২২. এসো মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিনী সাজে
২৩. এসো যুগ সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়

২৪. ঐ, ঐ, ঐ আসে কর্ণ কৌরব সেনানী
২৫. ওগো ঠাকুর!বলতে পার কোথায় তোমার দেশ
২৬. ওরে ও বীরসুত রাখিলি না কথা
২৭. ওরে মেঘনাদ, প্রিয় পুত্র ধন
২৮. কমলা রুপিনী, শক্তি-স্বরূপিনী
২৯. কর্ণ ভীমে মহারণ, কুরুক্ষেত্র রনে
৩০. কলহংসিকা বাহনা পদ্মিনী পাণি
৩১. কি বলিলে জননী গো, ত্যাজি দুর্যোধন
৩২. কীর্তন গায় ছুচন্দর
৩৩. কোন সে সূদুর অশোক-কাননে বন্দিনী তুমি সীতা
৩৪. কৌরবের সেনাপতি পড়ে রণ মাঝে
৩৫. কৌশল্যা কহেন রামে সজল নয়নে
৩৬. খড়ের প্রতিমা পূজিস্ রে তোরা, মাকে ত' তোরা পূজিসনে!
৩৭. গদা ও শ্যামা আজি সেনাপতি- সাজে
৩৮. গীতা জ্ঞান দিও দান
৩৯. গুরুমন্ত্র তোমার উঠল জ্বলে
৪০. গোলক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর
৪১. চলো মাতা চলো, চলো নিয়ে যাবো কোথা
৪২. জয় জয় মা গঙ্গা পতিত পাবনী ভাগীরথী
৪৩. জয় বাণী বিদ্যাদায়িণী
৪৪. জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীবীর চীর গৈরিকধারী
৪৫. জয় ভারতী শ্বেত শতদল বাসিনী
৪৬. জয় মর্ত্যের অমৃতবাদিনী চির আয়ুষ্মতী
৪৭. জয় শঙ্কর- শিষ্যা, কশ্যপ-দুহিতা মনসা
৪৮. জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ নমো নমঃ
৪৯. জাগো অমৃত-পিয়াসি-চিত আত্মা-অনিরুদ্ধ
৫০. জাগো জাগো দেবলোক
৫১. জাগো ভূপতি শুভ্রজ্যোতি নব প্রাণ প্রবুদ্ধ
৫২. তুমি দশরথ অযোধ্যাপতি, শুনেছি দয়ালু রাজা
৫৩. তুমি রাজা, নহ শুধু দ্বারকার
৫৪. তুমি সংহারে টানো যবে আমি হই শিব
৫৫. তৃতীয় পান্ডব আমি নামেতে অর্জুন
৫৬. দাও শৌর্য দাও ধৈর্য হে উদার নাথ
৫৭. দুঃখ সাগর মন্থন শেষ ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়

৫৮. দেবী তোমার চরণ কমল রাঙা তরুণ রাগে
৫৯. ধন্য তুমি মহারাজ, অঙ্গরাজ্য স্বামী
৬০. ধর্মক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র, চলিতেছে মহারণ
৬১. নব দুর্বাদল-শ্যাম জপ মন নাম শ্রীরঘুপতি রাম
৬২. নমঃ মাগো বিষহরি মা গো মনসা
৬৩. নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী বীণাপাণি
৬৪. নমো নমো নমঃ হিম-গিরি-সূতা দেবতা-মানস কন্যা
৬৫. নমো হে নমো যন্ত্রপাতি নমো নমো অশান্ত
৬৬. নিঠুর কপট সন্ন্যাসী
৬৭. পরম পুরুষ সিদ্ধ যোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার
৬৮. প্রণাম প্রণাম ও হে দেবরাজ
৬৯. প্রথম পার্থ মোর; চল মোর সাথে
৭০. প্রভাত বীণা তব বাজে হে
৭১. বল, বল, বল ওস্তাদ শ্রীরামচন্দ্রের কি হইবে
৭২. বাজাও শঙ্খ, বাজাও ঘন্টা, আকাশ পাতাল কাপায়ে
৭৩. বাজো বাঁশরি, বাজো বাঁশরি, বাজো বাঁশরি, বাজো বাজো বাজো
৭৪. বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ
৭৫. ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে
৭৬. ভুবনের নাথ! এ নব ভবনে তব আশিস
৭৭. মন জপ নাম শ্রীরঘুপতি রাম নব দূর্বাদলশ্যাম নয়নাভিরাম
৭৮. মরালী গমনশ্রী মদ অলস চরণে
৭৯. মৃতের দেশে নেমে এলো মাতৃনামের গঙ্গাধারা
৮০. মৃত্যু আহত দয়িতের তব শোনো করুণ মিনতি
৮১. যবে শুভ দরশন সূর্য নারায়ণ ওঠেন ভোরে
৮২. যাদের তরে এ সংসারে খাট্‌নু জনম ভোর
৮৩. রঘু কুলপতি রামচন্দ্র আওধকে অধিকারী
৮৪. রাজা কংস মথুরাতে করে অত্যাচার
৮৫. লক্ষ্মী মা তুই ওঠ গো আবার সাগর জলে সিনান করি
৮৬. লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে সোনার ঝাঁপি লয়ে করে
৮৭. লক্ষ্মী মাগো নারায়ণী আয় এ আঙিনাতে
৮৮. শঙ্খ বাজে না, ঘন্টা বাজে না, একি হলো যদুপতি
৮৯. শুভ্র সমুজ্জ্বল হে চির-নির্মল শান্ত অচঞ্চল ধ্রুব- জ্যোতি
৯০. শোনো, শোনো, অন্ধমুনি, সিন্ধু নহি আমি
৯১. শোনো, শোনো, সীতা দেবী বলি গো তোমারে

৯২. শ্রী রঘুপতিরাম লহ প্রণাম

৯৩. সখা, সখা হের কর্ণের দশা, রথ ছাড়ি ঐ ধুলার পরে

৯৪. সখি এ নিবিড় বিরহ-বেদনা সহিতে পারি না আর

৯৫. সজল কাজল-শ্যামল এসো

৯৬. সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি

৯৭. সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশিষ

৯৮. সীতা, সীতা, সীতা মোর নয়নের তারা

৯৯. হনুমান, বীর তুমি জানে সর্বজন

১০০. হরি এই তো বলার সময় বটে

১০১. হরি হরি, হর হর

১০২. হায় ভিখারি কাহার কাছে হাত পাতিলে হায়

১০৩. হৃদি বৃন্দাবন বিহারিণী তিনি রাধা

১০৪. হে ইন্দ্রানী ! এলে কার তরে

১০৫. হে দেব নারায়ণ, হয়েছে অপরাধ, ক্ষমা কর তুমি মোরে

১০৬. হে পরমাশক্তি পরা প্রেমময়ী তোমারি

১০৭. হে পাষাণ দেবতা

১০৮. হে বিধাতা ! হে বিধাতা ! হে বিধাতা !

১০৯. হে ব্রজকুমার শোনো শোনো মোর নিবেদন

১১০. হে মরণ-লক্ষ্মী ! খোলো অবগুণ্ঠন খোলো

১১১. হে মহামৌনী, তব প্রশান্ত গম্ভীর বাণী শোনাবে কবে

১১২. হে মহাশক্তি, তোমারে ফিরায়ে মায়ার শ্মশান হতে

১১৩. হে মাধব, হে মাধব, হে মাধব

১১৪. হের আহিরিণী মানস-গঙ্গা দুকূল পাথার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের একজন অবিসংবাদিত কবি, সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ। বাংলা সাহিত্য ও সংগীত তথা সাংস্কৃতিক জগতের অন্যতম পুরোধা পুরুষ কাজী নজরুল ইসলাম একজন ব্যতিক্রমী মৌলিক সৃজনশীল প্রতিভা; যিনি এই প্রতিভা নামক সোনার হরিণের যাদুকরী স্পর্শে হয়ে উঠেছেন এক অনন্য, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। অবিভক্ত বাংলার কলকাতাকেন্দ্রিক সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে অতি অল্প সময়ে তিনি তাঁর মেধা, প্রজ্ঞা ও মননশীলতা দ্বারা পৌঁছেছেন গণমানুষের দ্বারপ্রান্তে। তবে সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে সংগীতজ্ঞ হিসেবে তাঁর কীর্তি, সৃষ্টি এবং অর্জন তুলনারহিত বললেও অত্যুক্তি হয়না। এর অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে বিচিত্রতা ও গভীরতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে তিনি হয়ে উঠেছেন গণমানুষের শিল্পী ও কবি। একদিকে তিনি যেমন মা, মাটি, প্রেম, দ্রোহ প্রমুখ অনুষঙ্গ নিয়ে ভাব সংগীত সৃষ্টি করেছেন, অন্যদিকে অবলীলাক্রমে সমস্ত জাত, পাত, কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে সৃজন করেছেন সনাতন ধর্মীয় অসংখ্য গান। মুসলমান সমাজে গান করা বা শোনা কে এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। একজন মুসলিম হয়ে সনাতন ধর্মের সমস্ত অনুষঙ্গকে সংগীতময়তার প্রবাহে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সত্যিকার অর্থে এক অবিনাশী সৃষ্টি।

গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে, তিনি হিন্দুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, মুসলিম ঐতিহ্য, কোরআন প্রভৃতি উৎসকে অকৃপণভাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক আত্মবোধ এবং চৈতন্য তাঁর জীবন ও কর্মে পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং এক অর্থে তাঁকে বলা যায় অদ্বৈত সত্ত্বা সম্পন্ন মানুষ, কারণ তিনি উপলব্ধি করতেন সমস্ত পথের অন্ত এক পরম সত্ত্বাতেই যা গবেষণায় ফুটে উঠেছে।

মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিনি উদার ও প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে। একদিকে প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত সকল মানব হিতকর তত্ত্ব ও তথ্যের সমাহার ঘটিয়েছেন অন্যদিকে তৎকালীন সমাজ মুক্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ, উদারতার উদাহরণগুলোকে ব্যবহার করেছেন অনুপ্রেরণার অনুষঙ্গ হিসেবে। তিনি নির্দ্বিধায় ধর্মের মাঝে নিহিত মঙ্গলময় উপাদানগুলোকে ব্যক্তি মানুষের সম্মুখে উপস্থাপন করেছেন তাঁর সৃষ্টি দ্বারা এবং ধর্মদর্শন ও গভীর জীবনবোধের সমন্বয়ে সহজ, সরল, প্রাণবন্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এক নব উন্মাদনা।

সনাতন ধর্মীয় গানের ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। এর মূল কারণ হচ্ছে জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমন্বয়বাদী চেতনা। শৈশবেই তিনি কোরআন, পুরাণ, বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন এবং সমন্বয়ের চেষ্টা করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টিকর্মে উঠে এসেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীতে অগণিত মত ও পথ রয়েছে যার সবগুলোর মাঝেই বিধৃত রয়েছে শান্তি, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, মহত্ত্বের কথা। অবারিত উদারতায় তিনি দু'হাত ভরে গ্রহণ করেছেন সে সব উপাদান এবং অত্যন্ত শিল্পিতভাবে ব্যবহার করেছেন মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচনে।

প্রকৃতপক্ষে কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানের পরিধি সকল সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব ও আর্তমানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে ধাবিত। বৈচিত্রময় শ্রেণিকরণ এবং চমৎকার বাণী ও সুরের গভীরতায় সনাতন ধর্মীয় এ গানগুলো যেন বহ যুগের শৃঙ্খলকে ভাঙতে সক্ষম হয়েছিল এবং সকল মত ও পথের মানুষকে বহুকালের বর্ণবাদ, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দ্বৈরথে অবতীর্ণ হবার উদাত্ত আহ্বান জাগিয়েছিল। শিব, কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা, শ্যামা, আল্লাহ, ভগবান, প্রভু- সবই এক সর্বশক্তিমান পরম ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপের প্রকাশ- এই তত্ত্ববাণীটি নজরুল পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন মানুষে মানুষের ভেদাভেদ আর সংঘাতময় এই বাংলায়।

গবেষণার কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, শিল্পবোধ এবং শিল্পসৃষ্টির ক্ষমতা মানুষের শ্রেষ্ঠতম আশ্রয় ও শক্তিগুলোর একটি। অব্যক্ত কথা যখন শিল্পীর সৃজনশীল কলমের আঁচড়ে ব্যক্ত করা হয়, তা অনেক বেশি জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। নজরুলের সনাতন ধর্মীয় গানগুলোও ঠিক তেমনি কিছু অব্যক্ত কথার ব্যক্ত প্রতিধ্বনি; যেন বহু বছরের, বহুমানুষের অসংখ্য জমে থাকা বাণীর প্রতিফলন। শুধু সনাতন ধর্মে-ই না, বহু সংখ্যক মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মনে এ গানগুলো ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল যে এত সহজ, সরল, সাবলীলভাবে কিভাবে ঈশ্বরকে ডাকা সম্ভব, কিভাবে সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় এ গানগুলো আধ্যাত্মবাদের এক চরমসীমায় উপনীত হয়েছিল যা শুধুমাত্র অনুভূতি এবং অপার অনুভব দ্বারাই সৃজন করা সম্ভব। কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করতেন যে, এ বিশ্বসংসারের অতুল সম্পদ শুধুমাত্র বিনোদন বা মর্যাদাবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির লক্ষ্যে এর ব্যবহারের পাশাপাশি এই ক্ষমতার প্রয়োগ প্রয়োজন মানুষ এবং সমগ্র জীবসত্ত্বার আনন্দ এবং সৃজনকল্পে। আর্ট বা শিল্পের জন্য এ অনুভূতি যেমন অভূতপূর্ব তেমনি মানবজাতির জন্য একটি দার্শনিক দিকদর্শনও আছে এতে। আর এটি খুব স্বাভাবিক ছিল যে, কাজী নজরুলের এ বিশ্বাস, দর্শনের প্রতিফলন তাঁর সংগীতেও ঘটবে। গবেষণাকালে আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় গানগুলো গভীরতা এবং দর্শনতত্ত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং যথাযথ চর্চার মাধ্যমে এই গানগুলোর আধ্যাত্মিক সার সমাজস্থ মানুষের হৃদয় ও বিবেকের শুচিতাকে তীক্ষ্ণভাবে শাণিত করতে পারে। এই গবেষণায় কাজী নজরুল ইসলামের সনাতন ধর্মীয় সকল গানের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রস্ফুটিত হল যা পরবর্তীকালে নবতর গবেষকবৃন্দকে আরও এ সংক্রান্ত নতুন নতুন গবেষণার পথ প্রদর্শন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

- মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা*, *হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫।
- করুণাময় গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
- করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮।
- রফিকুল ইসলাম, *নজরুল জীবনী*, নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১৩।
- রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন*, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০১২।
- রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা*, মল্লিক ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮২।
- ড. মিলন দত্ত, *নজরুল জীবনচরিত*, প্রসাদ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৭৬।
- সৌমিত্র শেখর, *নজরুল: আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এবং শিল্পীর বোধ*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০১৩।
- ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, *নজরুল চরিত মানস*, দে'জ পাবলিশিং চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭।
- *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খন্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা নতুন সংস্করণ, ১৯৯৩।
- মাহবুব হাসান, *নজরুলের কবিতায় মিথ ও লোকজ উপাদান*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০০১।
- তাহা ইয়াসিন, *নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারা*, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০১৩।
- সাকার মুস্তাফা, *নজরুলের শ্যামাসাধনা ও শ্যামাসঙ্গীত*, অন্বেষা প্রকাশন, ৯ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৯।
- ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, *নজরুল সঙ্গীত নির্দেশিকা*, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৯।
- ইদ্‌রিস আলী, *নজরুল সঙ্গীতের সুর*, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা ১৯৯৭।
- রশিদুন্ নবী, *নজরুল সংগীতের নানা অনুষঙ্গ*, অনুপম প্রকাশনী, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০১৯।
- ড. মোঃ হারুন-অর-রশীদ, *নজরুল সাহিত্যে ধর্ম*, বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬।
- সন্‌জীদা খাতুন, *নজরুল-মানস*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮।
- মোরশেদ শফিউল হাসান, *নজরুল জীবনকথা*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬।
- শিমুল মাহমুদ, *নজরুল সাহিত্যে পুরাণ প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯।
- অনুপম হায়াৎ, *বহুমাত্রিক নজরুল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৭।
- মৃধা মো. মনিরুজ্জামান, *জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম*, মহাকাল, ঢাকা, ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

- অরুণ কুমার বসু, *নজরুল জীবনী*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ৭০০০২০, প্রকাশকাল: ২০০০।
- *শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত*, শ্রী'ম'কথিত, কম্পুকলার, ৬এ, আশুতোষ শীল লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রকাশকাল: ১৯৮৩।
- *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*, সম্পাদনা: রশিদুন্ নবী, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা ২০০৬।
- *নজরুল গীতি অখন্ড*, সম্পাদনা: আব্দুল আজীজ আল-আমান, পরিমার্জিত সম্পাদক: ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮।
- *নজরুলের পত্রাবলি*, সম্পাদনা: শাহাবুদ্দীন আহমদ, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৯৫।
- *নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা:চৌত্রিশতম সংকলন*, সম্পাদক মো: আব্দুর রাজ্জাক ভূঞা, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, ২০১৭।
- *বহুমাত্রিক নজরুল*, সম্পাদনা: হাসান হাফিজ, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫।
- *সার্বজনীন নজরুল*, সম্পাদনা: আবদুল হাই শিকদার, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬।
- Swami Jagadiswarananda, *Devi Mahatmyam,* Ramakrishna Math, 1953
- https://bn.banglapedia.org
- https://explorebengalheritage.com
- https://bn.m.wikipedia.org